Nahid Fuad

মেজর রাহাত

রাত ঘনঘোর

ইফতেখার আমিন

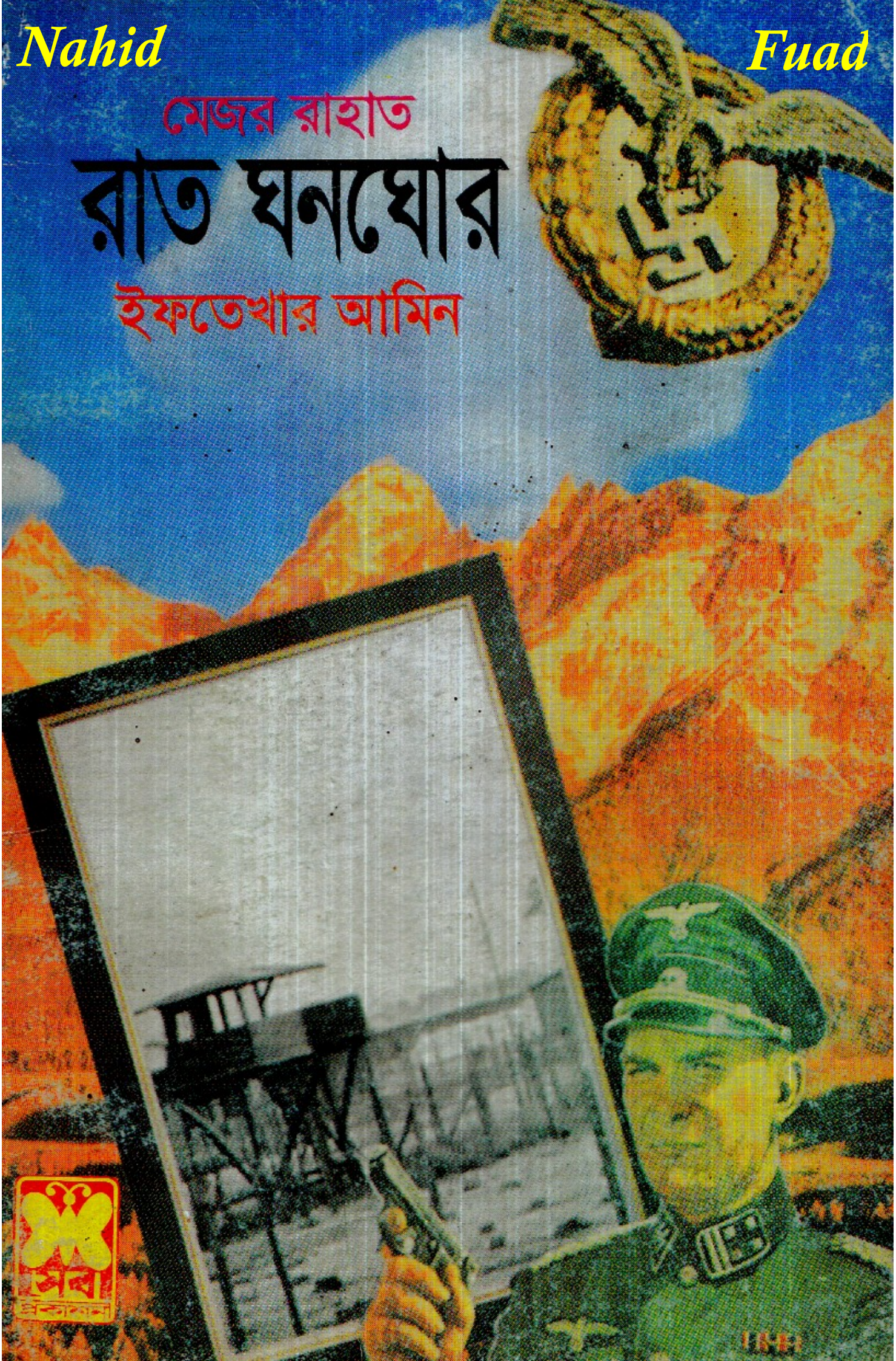

মেজর রাহাত

রাত ঘনঘোর

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে

ইফতেখার আমিন

জার্মান এসএস বা শুৎজস্টাফেল বাহিনীর সবচেয়ে
বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প—অশউইৎজ!
গেস্টাপোর হাতে বন্দী এক পোলিশ বিজ্ঞানীকে
ওখান থেকে বের করে আনতে হবে
'স্ট্রাইক ফোর্স'-প্রধান মেজর রাহাতকে।
সেই ক্যাম্প, বুলেট, গ্যাস ও আগুনে যেখানে
লাখ লাখ বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। সেই ক্যাম্প,
যার প্রবেশ পথে কোন এক হতভাগ্য লিখে রেখেছিল:
নাখ্ট্ আন্ড নেবেল!
রাত এবং কুয়াশা—অর্থাৎ এখানেই জীবনের
সমস্ত আশা-ভরসার সমাপ্তি।
বহু কষ্টে ঢুকে পড়ল রাহাত খান।
কে জানত, গেস্টাপো চীফ জেনে যাবে
ওর মিশনের কথা?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রাত ঘনঘোর

মেজর রাহাত

ইফতেখার আমিন

স্ক্যানিং এবং এডিটিং - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

বইটি দেয়ার জন্য নাহিদ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ

Website – Banglapdf.net

মেজর রাহাত

রাত ঘনঘোর

ইফতেখার আমিন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 0198 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: শারমিন সিদ্দিকা ঊর্মি

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

MAJOR RAHAT
RAT GHANAGHOR
A Thriller Novel
By' Iftekhar Amin

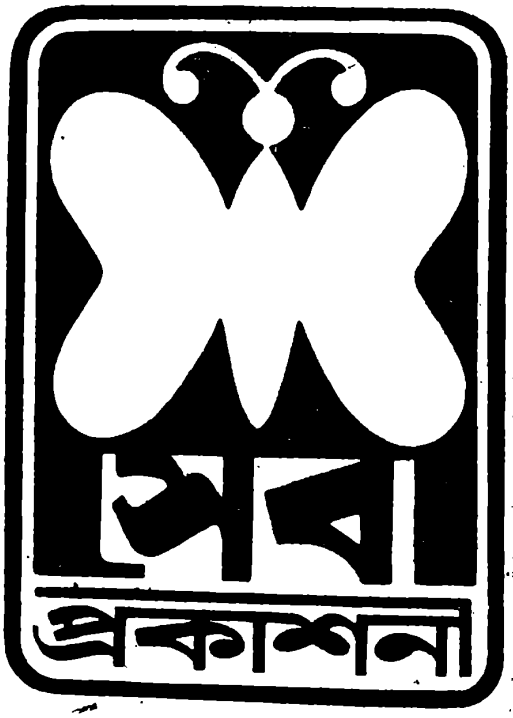

আটাশ টাকা

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নির্ভীক, অসমসাহসী
এক বাঙালী মেজর।
স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি অ্যাকাডেমির
অফিসারদের স্নেহের 'ওয়ান্ডার বয়'।
মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে গঠন
করা 'স্ট্রাইক ফোর্সের' নেতৃত্ব তুলে দেয়া
হয়েছে তার কাঁধে।
ভয়ঙ্কর একেকটা মিশন নিয়ে দুনিয়ার
এক মাথা থেকে আরেক মাথা ছুটে
বেড়াচ্ছে সে। দুঃস্বপ্ন আর মৃত্যুভয়
প্রতিমুহূর্তে পিছু লেগে আছে,
কিন্তু পরোয়া নেই।
আসুন, আপনার চেনা এই নিরহঙ্কার,
নিজের সম্পর্কে উদাসীন, দুঃসাহসী কমান্ডোর
ঘটনাবহুল অতীত জানতে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য
ইতিহাসের পাতায় একবার
নজর বোলানো যাক।

লেখকের
আরও ক'টি বই

অনুবাদ
মৃত্যুঞ্জয়, তিমির রাত্রি

রহস্যোপন্যাস
মরীচিকা, ক্ষুরদাঁত

রোমান্টিক
শুধু তোমাকে, সেইদিন চিরদিন

ওয়েস্টার্ন
প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশিযাত্রা

কিশোর ক্লাসিক
লা মিজারেবল

কিশোর অনুবাদ
হারবেনি

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

দানযিগ রেল স্টেশন আর সিটাডেল ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় পুরু বরফের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ছাইরঙা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। ছয়তলা। দুই রুমের ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট। একশো বছরেরও বেশি পুরানো আবাসিক এলাকা।

দুই সারি বিল্ডিঙের মাঝে চোদ্দ ফুট চওড়া খোয়া বাঁধানো মেইন রোড। শাখা রোড সব আট ফুটী। মেইন রোডটা আসলে কানাগলি। এক বিল্ডিঙের সিঁড়ি ঘরের দরজায় পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। ওটার সর্বোচ্চ তলার রাস্তার দিকের জানালায় এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পর্দা ফাঁক করে রাস্তা দেখছে। বোঝা যায় কারও জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছে সে—ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন।

সামনের ঢালু ছাদগুলোয় বরফের পুরু আস্তর। নির্দিষ্ট কিছু কিছু জায়গা অবশ্য ফাঁকা, কালচে টালি দাঁত বের করে আছে। টপ্ ফ্লোর অ্যাপার্টমেন্টের ফায়ারপ্লেসের উত্তাপ বরফ জমতে দিচ্ছে না ওসব জায়গায়। প্রত্যেকটা ছাদের ওই বিশেষ অংশ বরফমুক্ত থাকার কথা ছিল, কিন্তু জার্মান অধিকৃত পোল্যান্ডে সাধারণ মানুষের জন্যে জ্বালানী তো পরের কথা, খাবারই মহা দুষ্প্রাপ্য এবার। সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে যদি এক টুকরো রুটি আর সামান্য পনির জোটানো যায়, তাই অনেক বড় ভাগ্যের ব্যাপার।

সামনের রাস্তায় খাবার সংগ্রহের লম্বা লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে ওপরের লোকটা। শীতের অসহ্য কামড়ের হাত থেকে

বাঁচার জন্যে কোটের কলার তুলে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহল্লাবাসী। দীর্ঘ লাইন, পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে। বরাদ্দ খাবার হাতে পাওয়ামাত্র সাত রাজার ধনের মত দু'হাতে বুকের সাথে আঁকড়ে ধরছে লোকগুলো, অথবা ওভারকোটের তলায় গুঁজছে, পাছে ছিনতাই হয়ে যায়, সেই ভয়ে।

দেহের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল লোকটা, ঘড়ি দেখল। মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে আবার বাইরে নজর দিল। মেইন রোডের ও মাথার দিকে তাকাল। বারো-চোদ্দজন মানুষ, ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে ঝুলছে ওখানে ফাঁসীর জমাট বাঁধা দড়ির এক প্রান্তে। থেকে থেকে বাতাসে দোল খাচ্ছে, ঘুরছে। কট্ কট্ আওয়াজ করছে দড়ি। বাহাত্তর ঘণ্টা হতে চলল লাশগুলো ঝুলছে। হতভাগ্যদের ভাগ্যে মাটি জুটবে কিনা, জুটলে কবে, কেউ জানে না। পরনে একটা সুতোও নেই ওদের।

দানযিগ তো কিছু নয়, পুরো পোল্যান্ডই যে এখন রুশো-জার্মান মৈত্রী চুক্তির অধীনে, হিটলার-স্ট্যালিনের পিঠা ভাগের মত ভাগাভাগি হয়ে গেছে, লাশগুলো তার নীরব সাক্ষী।

অতীতে জার্মানিরই অংশ ছিল দানযিগ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাইজারের আত্মসমর্পণের পর ভার্সেই চুক্তির অধীনে ওটাকে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, ফ্রী সিটি অভ দানযিগ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু হিটলার তা কখনও মেনে নেননি।

১৯৩৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে জার্মানি দানযিগ দখল করে নেয়, তারপর হাত বাড়ায় পোল্যান্ডের দিকে। হিটলারের ইওরোপ জয়ের প্রথম বলি ছিল পোল্যান্ড। অবিশ্বাস্য ক্ষমতাধর জার্মান বাহিনীকে প্রতিরোধ করার কথা চিন্তা করার সুযোগও পায়নি পোল্যান্ড সরকার। মাত্র পাঁচদিন পর ওয়ারশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে লুবলিনে নিজেদের সদর দফতর খোলে তারা। ১৯ সেপ্টেম্বর সেখান থেকেও পালাতে হয়। রুমানিয়ায় আশ্রয় নেয় পোলিশ প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা। বন্দী

করেছে তাদের বুখারেস্ট।

এর দু'দিন আগে হিটলারের সাথে পিঠা ভাগে অংশ নেয় স্ট্যালিন। পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলো দখল করে নেয় রেড আর্মি। দেশটাকে প্রায় সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছে ওরা। অবশ্য জার্মানি জিতেছে ভাগাভাগিতে। পশ্চিম অংশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত শিল্প-কারখানা আর উর্বর জমিসহ বাইশ মিলিয়ন পোলিশ তার কবজায়। রাশিয়া পেয়েছে অনুর্বর, পতিত জমি আর চোদ্দ মিলিয়ন পোলিশ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। ওয়ারশর পথেঘাটে আজকাল হরদম চোখে পড়ে পাকা ফলের মত ঝুলন্ত লাশ। শুধু ইচ্ছে হলেই হলো, যাকে-তাকে, যখন-তখন এভাবে ফাঁসীতে ঝোলায় জার্মান গেস্টাপো বাহিনী। অন্যদের বেলায় সামান্য দ্বিধা থাকলেও ইহুদীদের বেলায় কোনকিছুরই বালাই নেই।

সহজে যাতে চেনা যায়, সে জন্যে প্রত্যেক ইহুদীর বাঁ হাতে উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্টার অভ ডেভিড পরা এখানে বাধ্যতামূলক। কোটের আস্তিনে সেলাই করে ঝোলাতে হবে। ট্রামে চড়া নিষেধ ইহুদীদের। যেখানেই হোক, হেঁটে যেতে হবে। আরও কত হাজারো বিধিনিষেধ।

ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা লাল ভেলভেট কার্টেন ছেড়ে। সে-ও ইহুদী, তবে অন্যদের মত সাইনবোর্ড নেই হাতে। সাধারণদের তুলনায় যথেষ্ট সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সে, দীর্ঘদেহী। ভয়ের লেশমাত্র নেই চেহারায়।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে দ্রুত।

চিন্তিত চেহারায় ঘরের চারদিকে নজর বোলাল লোকটা। সবুজ ভেলভেটের আপহোলস্টারিমোড়া এক সেট সোফা, সূক্ষ্ম কারুকাজ করা একটা বড় রোল-টপ্ ডেস্ক, একটা স্যুইভেল চেয়ার, দুটো পিঠ খাড়া আর্ম চেয়ার, এবং পুরু লাল কার্পেট আর দেয়ালে একটা বড় অয়েল পেইন্টিঙ, এই হচ্ছে রূমের আসবাব ও

সজ্জা। অবশ্য এক কোণে একটা খুদে লিকার কেবিনেটও আছে। চমৎকার নকশা করা। ওপরে রাখা আছে হুইস্কির বোতল ও গ্লাস।

সেদিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল মানুষটা, কিন্তু দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল। ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। কেমন একটা আওয়াজ আসছে না? কান খাড়া করল সে। হ্যাঁ, তাই তো! আওয়াজটা কিসের, ছাদে বরফের চাক ভাঙছে? নাহ্! ফায়ারপ্লেসে জ্বলন্ত কাঠ ফুটছে? উঁহুঁ! রেশনের লাইনে কোন হট্টগোল? আপনমনে মাথা দোলাল লোকটা, তাও নয়। কি যেন বৈশিষ্ট্য আছে ওটার। অশুভ কিছু, ভীতিকর। রাস্তার দিক থেকে আসছে।

চর্কির মত আধ পাক্ খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। দ্রুত জানালার কাছে চলে এল আবার। আওয়াজটা ততক্ষণে বহুগুণ বেড়ে গেছে।

পর্দা সরাতে আরও বাড়ল। গমগমে আওয়াজ, সেই সাথে তাল মিলিয়ে মাটি কাঁপছে। জার্মান মার্সিডিজ এঞ্জিনের আওয়াজ, ভাবল সে। ট্রুপ ক্যারিয়ার! হাফ-ট্রাক, ট্রাক, সাইড কারওয়ালা বিএমডব্লিউ মোটর বাইক, অফিসার বহুনকারী হুড খোলা কার। এদিকেই আসছে ওরা। তার মানে আবার রেইড!

পর্দার ফাঁক দিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। সামনের গলিপথ প্রায় আড়াল করে রেখেছে হাঁসের পালকের মত উড়ন্ত তুষার, দেখা যায় না ভালমত। জানালার কাঁচের ঘাম মুছল সে ব্যস্ত হয়ে, যেন তাতেই দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হবে। ধড়ফড় করছে বুকের মধ্যে।

আওয়াজটা গর্জনে পরিণত হয়েছে এখন। একটু পরই দেখা দিল দুটো বাইক। পিছনে স্টাফ কার এবং তারপর একটা···দুটো···তিনটে হাফ-ট্রাক। গ্রেটকোট আর কয়লার খুদে ঝুড়ি আকারের ছাইরঙা হেলমেট পরা জার্মান সৈন্য গিজগিজ করছে শেষেরগুলোয়। ওয়াফেন–এসএস।

সারফেসের নরম তুষারে ব্রেক কষে দাঁড়াল বাইক, স্কিড্ করে

ঘুরে গেল। একটার পিছনদিক ঘষা খেল রাস্তা সংলগ্ন এক বাড়ির দেয়ালে, পাথর আর ইস্পাতের ঘষায় আগুনের ফুল্‌কি ছুটল তারাবাতির মত।

পুরো ব্লকের জীবনযাত্রা হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। বিপদের আভাস পেয়ে বাতাসও দিক বদলাল যেন।

স্টাফ কারের দরজা খুলে নেমে এল হাই-পীকড্ ক্যাপ পরা গেস্টাপোর এক শাহরফিউরার (গার্ড কমান্ডার)। তারপরই হুড়মুড় করে নামল সৈন্যরা। বরফে ঘন ঘন পা ঠুকে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টার ফাঁকে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। মুখে কিছু বলল না অফিসার, শুধু হাত তুলে দেখাল কোথায় যেতে হবে ওদের।

ঝাঁকি খেয়ে নিজের মধ্যে ফিরে এল ওপরের লোকটা। এক লাফে ডেস্কের কাছে এসে উল্টে দিল ওটার টপ্। ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে কিছু ডকুমেন্টস্, ছবি, অ্যাকাউন্ট বুকস্। থাবা দিয়ে ওগুলো তুলে নিল সে, বাথরুমের দিকে ছুটল। মনে মনে কাকে যেন গালাগালি করছে। বিড়বিড় করছে, 'আমি কি করব!...সময়মত কেন আসোনি!...এখন সব নষ্ট করে ফেলা ছাড়া কিছু করার নেই...!'

আধমিনিট পর বাথরুম থেকে বের হলো সে। এত শীতেও ঘামছে। চেহারায় আতঙ্ক, আফসোস আর তীব্র হতাশা। বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে পাক্ খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া—বহু মূল্যবান ডকুমেন্টস্‌গুলো পুড়ছে। আবার কোনদিন হয়তো ওসব তৈরি করতে পারবে সে, যদি বেঁচে থাকে। এবং যদি সুযোগ আর পরিবেশ জোটে। মনে মনে যদিও নিশ্চিত জানে, সেদিন আর আসবে না কখনও। একটা সুবর্ণ সুযোগ হারাল ওরা। শেষ হয়ে গেল সব।

হঠাৎ সমস্ত ভয়-আতঙ্ক জয় করে ফেলল মানুষটা। সহজ, স্বাভাবিক হেঁটে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল। ওরা তো এলই না,

ভাবছে তিক্ত মনে, সে যে নিজের চেষ্টায় পালাবে, সে পথও আর রইল না। এমনিতেই গত ক'দিন থেকে প্রতি মুহূর্ত কারা যেন ছায়ার মত তার পিছু লেগে আছে। ব্যাপার টের পেয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত···।

নিচের চিৎকার আর হুড়োহুড়িতে ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল। ঠাণ্ডা কাঁচে নাক ঠেকিয়ে তাকাল সে। রেশনের লাইন উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই, রাস্তায় অন্য খেলা চলছে। ভয়ে বাড়িঘরের দরজা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভারী বুটপরা পায়ে সেগুলোর ওপর কষে লাথি মারছে সৈন্যরা। রাইফেলের বাঁট দিয়ে দমাদম পিটিয়ে চলেছে একনাগাড়ে।

একটা-দুটো করে খুলে যাচ্ছে দরজা। না খুললে কপালে খারাবি বেশি ঘটবে, তাই খুলে দিচ্ছে বাসিন্দারা। ত্রাসে বাঁশপাতার মত কাঁপছে সবাই। রাস্তা খোলা পেয়ে দমকা বাতাসের মত ভেতরে ঢুকে পড়ছে এসএস বাহিনী, বুট আর বাঁট দিয়ে মারতে মারতে ভেতরের সবাইকে বের করে আনছে খোলা জায়গায়। বুড়ো বা শিশুদেরও রেহাই দিচ্ছে না। গরু-ছাগলের মত খেদিয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে। তাদের আতঙ্কিত চিৎকার ও কান্নার আওয়াজে ভারী হয়ে উঠল পুরানো ওয়ারশ। সৈন্যদের মধ্যে কিছু জার্মান পুলিসও দেখতে পেল লোকটা।

চেনা এক বুড়ির উপর চোখ আটকে গেল। মিসেস পিয়েরযাক। সত্তরের বেশি বয়স হবে তার। স্থূলদেহী, বাতের জন্যে হাঁটতে খুব কষ্ট হয় বেচারীর। এক সৈন্য কোটের কলার ধরে তুষারের ওপর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে তাকে। লোকটার গ্রেটকোট মুঠো করে ধরে তাকে নিজের অসহায়ত্বের কথা বোঝাতে চাইছিল বোধহয় বুড়ি, ব্যথায় বিকৃত চেহারায় হাত নেড়ে বলতে চাইল সে অসুস্থ।

রেগে উঠল এসএস। তাকে ছেড়ে দু'হাতে রাইফেল তুলল, সভয়ে চোখ বুজল ওপরের লোকটা, কিন্তু ভেতরের কোন এক

অদৃশ্য শক্তি সঙ্গে সঙ্গে ফের তাকাতে বাধ্য করল। তখনই পড়ল প্রথম বাড়ি। মাথা প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল মিসেস পিয়েরযাকের, নেতিয়ে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়ায় মুঠো আপনাআপনি আরও কঠিন হয়ে উঠল তার। রাগ তাতে বেড়ে গেল সৈনিকের, পর পর আরও দুটো বাড়ি মারল সে বুড়ির কানের পাশে।

দু'ভাগ হয়ে গেল খুলি, প্রায় স্থির হয়ে গেছে মহিলা। মাথার কাছে বরফের রঙ খুব দ্রুত বদলে যেতে শুরু করেছে। মৃত্যুর হিমশীতল ছোঁয়া পেতে খিঁচুনি উঠল জর্জরিত দেহে। বার দুয়েক টান্ টান্ হলো নিয়ন্ত্রণহীন হাত-পা, মেরুদণ্ড, তারপর আচমকা থেমে গেল সে। চতুর্থ ও পঞ্চম আঘাত টেরই পেল না। তার রক্তে মাখামাখি হওয়া থেকে বুট বাঁচাতে এক লাফে সরে গেল এসএস। দু'চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকল মৃতদেহটার দিকে। পরিশ্রমের ফলে ঘন ঘন ওঠানামা করছে বুক। তার লাফ দেখে পাশ থেকে আরেক সৈনিক হো হো করে হেসে উঠল, যেন ভারি মজার একটা কাণ্ড চাক্ষুষ করেছে সে।

কচি কণ্ঠের এক মেয়েলী চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল লোকটা। এক তরুণ দম্পতিকে কাছের আরেক ঘর থেকে হিড়হিড় করে টেনে আনা হয়েছে বাইরে। ওদের চেনে না সে, এই প্রথম দেখছে। এক দীর্ঘদেহী এনসিও একহাতে মেয়েটির চুল মুঠো করে ধরে আরেক হাতে ফড়াৎ করে টেনে ছিঁড়ে ফেলল ড্রেস। পরক্ষণে চোখের সামনে তার উদ্ধত, ভরাট বুকের কাঁপন দেখে হাঁ হয়ে গেল।

অফিসারকে সেদিকে হাত বাড়াতে দেখে চেঁচিয়ে কিছু বলল যুবক, ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নগ্ন বুক দেখার কাজে ব্যস্ত, অসতর্ক দুই সৈনিকের হাত থেকে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুরো এক পা-ও এগোতে পারেনি সে, বদ্ধ কানাগলি কেঁপে উঠল পিস্তলের সিঙ্গল শটের আওয়াজে। দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলে কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল তা। ততক্ষণে

যুবকের নড়াচড়া থেমে গেছে। মুখ থুবড়ে মিসেস পিয়েরযাকের কাছে পড়ে আছে সে। দু'জনের রক্তে অনেকটা জায়গা লাল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। তরুণী বধূর বুকফাটা কান্নায় আরেকবার কেঁপে উঠল কানাগলি।

আঁধারের সাথে তুষারপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় আর কিছু দেখতে পেল না লোকটা। বাথরুমের দিকে তাকাল। ঝামেলা শেষ। সব প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে। ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। সতর্কতার সাথে সমস্ত ছাই তুলে কমোডে ফেলল সে, ফ্ল্যাশ করে দিল। মেঝেতে ভাল করে নজর বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দম নিল লম্বা করে। সন্তুষ্ট। তখনই সিঁড়িতে কয়েক জোড়া ব্যস্ত বুটের আওয়াজ উঠল।

দরজায় জোর চাপড়ের আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেল লোকটা, বোল্ট খুলে এসএসদের ঢোকার পথ করে দিল।

সেদিন তাকেসহ মোট সাতচল্লিশজনকে গ্রেফতার করল গেস্টাপো। রেইডের সময় মারা গেল তিনজন। সবাই ইহুদী অবশ্য। আবর্জনা।

পরম সৌভাগ্যবান হলে এদের কেউ হয়তো কোনদিন মুক্তি পাবে। নয়ত ফাঁসীতে ঝুলবে, অথবা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে মরবে।

সেদিন ছিল ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০।

রোববার।

দুই

ডোভার, ইংল্যান্ড। জুন, ১৯৪০।

সার্জেন্ট হিগিনসের কোন্ ধারণাই নেই মেজর রাহাত খান সম্পর্কে। সে কে, কোন্ দেশী, উপকূলে কি করছে, কিছুই জানে না লোকটা। শুধু জানে মেজরকে দুপুরের আগে কাছের ফোকস্টোন এয়ার বেজে পৌঁছে দিতে হবে তাকে।

তাই করছে সে, মেজরকে পাশে বসিয়ে তুমুল গতিতে জীপ ছোটাচ্ছে উপকূলীয় হাইওয়ে ধরে। পথে প্রচুর ট্রাফিক, নব্বই ভাগই আর্মির। ডোভারসহ চ্যানেলের পুরো উপকূল জুড়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততা চলছে। ফ্রান্স ছেড়ে পিছিয়ে এসে এপারে নিজের প্রতিরক্ষা বুহ্য খাড়া করছে ইংল্যান্ড। সে জন্যেই এই অবস্থা।

ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে ফ্রান্সে। কয়েক মাসের অক্লান্ত প্ল্যানিং আর পরিশ্রম মাঠে মারা গেছে দুর্ধর্ষ জার্মান প্যানজার বাহিনীর বেপরোয়া অগ্রযাত্রার মুখে। এখন আগে ঘর সামলাতে হবে ইংল্যান্ডকে, তারপর অন্য কথা।

আড়চোখে মেজরের দিকে তাকাল সার্জেন্ট। মনে হলো কি যেন ভাবছে লোকটা। হালকা পাতলা গড়ন, বেশ শুকনো। পাঁচ ফুট নয়, কি সাড়ে নয় হবে উচ্চতা, অনুমান করল হিগিনস। মুখটা সামান্য লম্বাটে। চওড়া, জোড়া ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। এত গম্ভীর কেন মানুষটা? গাড়িতে উঠে এ পর্যন্ত দুটো কথা বলেছে কি না সন্দেহ। একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে জাগল

সার্জেন্টের।

'জীপটা দারুণ চলে, কি বলেন, স্যার?' বলল সে।

'অ্যাঁ?'

অস্বাভাবিক ভরাট গলা শুনে অবাক হলো হিগিনস। অমন চিমসে মার্কা পেট থেকে অত মোটা আওয়াজ বের হয় কি করে ভেবে পেল না। 'গাড়িটার কথা বলছিলাম, স্যার। দারুণ চলে, তাই।'

'হ্যাঁ।' মৃদু হাসি ফুটল রাহাতের মুখে। কিন্তু চোখের ধারেকাছেও পৌঁছল না তার রেশ। তাই দেখেই সার্জেন্ট বুঝে নিল কড়া মাল, না ঘাঁটানোই ভাল।

নিজের চিন্তায় ডুবে গেল মেজর। '৩৬ সালে ইংল্যান্ডের স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমি থেকে পাস করেছে সে, যোগ দিয়েছে ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সে। ইচ্ছে ছিল দু'বছর এদের সাথে থেকে কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফিরে যাবে প্রিয় মাতৃভূমিতে—ভারতবর্ষে। কিন্তু ইওরোপের পরিস্থিতি একটু একটু করে এমন জটিল হয়ে দাঁড়াল, চোখের সামনে একের পর এক এতকিছু ঘটতে লাগল যে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

জার্মান বাহিনীর একের পর এক দেশ দখল করা দেখে ঘাবড়ে গেল ফ্রান্স। তাকে রক্ষা করতে নিজের এক লাখ ষাট হাজার সৈন্য পাঠাল ইংল্যান্ড, মেজর রাহাত ছিল তার মধ্যে। শত্রু বাহিনীর গতিবিধি, পরবর্তী টার্গেট, ইত্যাদি খবর জোগাড় করে মিত্র বাহিনীকে সতর্ক করা ছিল ওর কাজ।

সময়ের কাজ সময়মতই করেছে রাহাত, ইঙ্গ-ফরাসী যৌথ বাহিনীও নিজেদের কাজে ত্রুটি রাখেনি, তবু শেষ রক্ষা করা গেল না। মাত্র এক মাস চার দিনে শোচনীয় হার হলো ফ্রান্সের, বীরদর্পে প্যারিসে ঢুকল নাজি বাহিনী। বাধ্য হয়ে চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ফিরে আসতে হলো ওদের।

দু'সপ্তাহের মত হলো ডোভার পৌঁছেছে মেজর রাহাত খান,

এখনও ঠিকমত গুছিয়ে বসতে পারেনি। এমন সময় ডাক এসেছে লন্ডন থেকে। ও যাদের হয়ে কাজ করে, সেই স্পেশাল অপারেশনস্ এজেন্সির ডিভিশন ফোর ডেকে পাঠিয়েছে। ডাকের ধরন দেখলে বোঝা যায় কারণ যা-ই হোক, খুবই জরুরী। সেটা কি হতে পারে, তাই ভাবছে ও। সার্জেন্ট হিগিনসের গলা শুনে ধ্যান ভাঙল। 'আমরা এসে পড়েছি, স্যার।'

নেমে পড়ল রাহাত। 'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।'

বেজ কমান্ড্যান্টের অফিসে রিপোর্ট করল ও, সঙ্গে সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দশ মিনিটের মাথায় ওকে নিয়ে আকাশে উঠল এক ফাইটার।

লন্ডন। বিকেল তিনটা।

ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের একটু দূরের এক বহুতল ভবনের সামনে এসে দাঁড়াল ওকে বহনকারী আরেক আর্মি জীপ। ডিভিশন ফোরের শাখা অফিস ওটার পুরো গ্রাউন্ড ফ্লোর জুড়ে। দৃঢ় পায়ে ঢুকে পড়ল ও। প্রচুর স্টাফ, সবাই ভীষণ রকম ব্যস্ত। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গা বাঁচিয়ে এগোল রাহাত, বর্তমান শাখা প্রধান কর্নেল জেফরি আলেকজান্ডার বীকনের তরুণী, স্বর্ণকেশী সেক্রেটারির অফিসে ঢুকল। ওর ফ্রান্স পোস্টিঙের সময় যিনি শাখা প্রধান ছিলেন, তিনি অন্য কোথাও বদলি হয়ে গেছেন। এই মেয়েটিও নতুন। আগে কখনও দেখেনি রাহাত। ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় তাকে আসার কারণ বলল ও, খুব সংক্ষেপে।

ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়ানো দারুণ স্মার্ট, ভারি হ্যান্ডসাম যুবককে বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধার চোখে দেখল মেয়েটি। চট্ করে উঠে পড়ল, এক চিলতে মোহিনী হাসি উপহার দিয়ে বলল, 'জাস্ট আ মোমেন্ট, মেজর!'

অদৃশ্য এক দেয়ালে বাউন্স করল তার অমন দামী হাসিটা, কারণ যার জন্যে ওটা ছোঁড়া, সে দেখেইনি। অন্য কাজে ব্যস্ত।

ভুরু কুঁচকে হাতঘড়ি দেখছে। চেহারায় বিরক্তির ছাপ। দু'মিনিট লেট সে।

শ্রাগ করে ইনার অফিসে ঢুকল সেক্রেটারি এবং প্রায় তক্ষুণি বেরিয়ে এল। দরজা মেলে ধরে মাথা ঝাঁকাল মেজরের উদ্দেশে। 'প্লীজ, কাম ইন, স্যার!'

'ধন্যবাদ,' মৃদু গলায় বলে ভেতরে ঢুকল সে। কর্নেলের ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকল। 'মেজর রাহাত খান রিপোর্টিং, স্যার।'

চেয়ার ছেড়ে স্যালুটের জবাব দিলেন মাঝবয়সী, হাফ টেকো কর্নেল। হাত বাড়ালেন ঝুঁকে। 'হ্যালো, মেজর! নাইস টু মীট ইউ। বোসো, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' ক্যাপ টেবিলে রেখে বসল সে মেরুদণ্ড খাড়া রেখে। 'ট্রাফিক জ্যামের জন্যে দেরি...'

'মাত্র দু'মিনিট, মেজর,' কর্নেলের বড়সড় গোল মুখে হাসি ফুটল। 'যুদ্ধের কারণে লন্ডন ট্রাফিকের যে দশা হয়েছে, তাতে তোমার দু'ঘণ্টা লেট হলেও আমি অবাক হতাম না। বরং সময়মতই পৌঁছেছ তুমি।'

ঘড়ি দেখলেন কর্নেল। 'আধ ঘণ্টা পর হোয়াইটহল পৌঁছতে হবে আমাদের। যথেষ্ট সময় আছে। কফি হতে পারে এই ফাঁকে, কি বলো?' ওকে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিতে দেখে ইন্টারকমে দু'কাপ কফির নির্দেশ পাঠালেন কর্নেল।

তারপর মন দিলেন ওর দিকে। মিলিটারি একাডেমি প্রধানের পাঠানো ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে মিলিয়ে নিলেন। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ মেজর রাহাত, বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। ভারতীয় বাঙালী, ঢাকার ছেলে। ছিপছিপে, সুঠামদেহী। মুখটা সমান্য লম্বাটে। চওড়া, জোড়া ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

প্রিন্সিপ্যালের মতে প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছেলে। গম্ভীর। কাজ দু'কথায় সারা গেলে তিন কথা বলে না। হাঁটা-চলা, দাঁড়ানো-

বসা, কথা বলার ঢঙ, সবকিছুর মধ্যে স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য আছে মেজরের। হাজারো জনের মধ্যেও খুব সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। একাডেমির ইন্সট্রাক্টররা 'ওয়ান্ডারবয়' ডাকত। নিজের ব্যাচে সেরা ক্যাডেট ছিল রাহাত খান, ট্রেনিঙের প্রতিটা শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ছাত্র। মাতৃভাষা ছাড়া ছয়টা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে। তুখোড় স্ট্রাটেজিস্ট, দুঃসাহসী কমান্ডো।

প্রিন্সিপ্যাল বাড়িয়ে বলেননি, কর্নেল বীকন ভাবলেন। গোঁফ দেখে যেমন শিকারী বেড়াল চেনা যায়, তেমনি চেহারা দেখে এর প্রকৃতিও অনুমান করা যায়।

জার্মানির বিরুদ্ধে ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় এ ধরনের নির্ভীক, দুঃসাহসী যোদ্ধার অভাব দেখা দিয়েছে ইংল্যান্ডে। নতুন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল শপথ নেয়ার ক'দিন পর তাঁকে জানানো হয়েছে সে কথা। তাঁরই পরামর্শে পরে নতুন পদক্ষেপ নিয়েছে ডিভিশন ফোর। স্যান্ডহার্স্টসহ অন্য সব মিলিটারি একাডেমি থেকে পাস করা যত প্রতিভাবান ছাত্র আছে, সবাইকে জরুরী তলব করেছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। জাতির মহাদুর্যোগে তাদের সাহায্য দরকার ব্রিটেনের।

কফি শেষ করে ড্রয়ার থেকে একটা ফোল্ডার বের করলেন কর্নেল। 'চলো, মেজর, যাওয়া যাক।' বিনা প্রশ্নে উঠে পড়ল ও।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট আগে হোয়াইটহল পৌঁছল দু'জনে। ডিভিশন ফোরের হেড লে. জেনারেল অ্যান্থনি হপকিন্স্ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বাহান্ন থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে বয়স তাঁর। ঝাড়া ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ। হাসি খুশি, খোলা মনের মানুষ। কয়েক র‍্যাঙ্কের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রায় বন্ধুর মত আচরণ করলেন ভদ্রলোক। ধীরেসুস্থে জানালেন, কেন তলব করে আনা হয়েছে মেজর রাহাতকে।

সেটা হলো: প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ডিভিশন ফোর 'স্ট্রাইক

ফোর্স' নামে বিশেষ এক ক্র্যাক কমান্ডো বাহিনী গঠন করতে যাচ্ছে। প্রয়োজনের সময় শত্রু লাইনের পিছনে বিশেষ দায়িত্ব পালন করবে ফোর্সের সদস্যরা। তাদের সাহায্য করার জন্যে সমস্ত মিত্র দেশে বাছাই করা ইনফর্মার থাকবে, সাহায্যকারী থাকবে। সাধারণ প্রতিরোধ মুভমেন্টের সদস্যসহ সরকারী অফিসার, সবাই আছে তার মধ্যে।

তাদের দেশওয়ারি নামে তালিকা তৈরি হয়ে আছে, এখন শুধু ফোর্স গঠন বাকি।

বলা শেষ হতে মৃদু হাসি ফুটল লে. জেনারেলের মুখে। 'স্যান্ডহার্স্টের প্রিন্সিপ্যাল তোমার ব্যাপারে যে লম্বা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তা পড়ে 'স্ট্রাইক ফোর্স' চীফ হিসেবে তোমাকে সিলেক্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই জন্যে ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে।'

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে খুক্ করে কাশলেন লে. জেনারেল। 'ওয়েল, মেজর!'

'আমি...আমি প্রস্তুত, স্যার,' কোনমতে বলল রাহাত। 'আ'য়্যাম হাইলি অনারড্, স্যার। অ্যান্ড ভেরি গ্রেটফুল।'

'গুড!' কর্নেল বীকনের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কাগজপত্র?'

হাতের ফোল্ডার তাঁর সামনে মেলে ধরল সে। 'এই যে, স্যার। সব আছে এরমধ্যে।'

ভেতরে দামী, পুরু কাগজের কয়েকটা শীট দেখতে পেল রাহাত খান। পরিচ্ছন্ন টাইপ করা ডকুমেন্টস্। উল্টেপাল্টে সবগুলো দেখলেন হপকিন্স, তারপর ফোল্ডার বন্ধ করে রাহাতের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন। 'লেট'স গো, মেজর।'

বিশ মিনিট পর জেনারেলের স্টাফ কার বাঁক নিয়ে ডাউনিং স্ট্রীটে ঢুকল। বুঝল রাহাত কার সাথে দেখা করতে এসেছে। ঐতিহাসিক ১০ নম্বর বাড়ির সামনের প্রশস্ত চত্বরে থামল গাড়ি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত নেভিল চেম্বারলিন ছিলেন এখানকার বাসিন্দা, এখন উইনস্টন চার্চিল।

সোনালী অক্ষরে 10 লেখা পুরু মেহগনি কাঠের চকচকে, প্রকাণ্ড দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রধানমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তা ও পি.এস.। তাদের অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রীর রাজসিক ভিজিটর'স রুমে এসে ঢুকল তিনজনের দলটা। ও মাথায় প্রকাণ্ড এক ডেস্ক, তার ওপাশে বসে আছেন বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম দিক্‌পাল, চার্চিল।

চওড়া কপাল। কপালের দু'পাশে টাক, ব্যাকব্রাশ করা বাকি চুলের প্রায় সবই পাকা। খাড়া নাক, বড়, ভাসা ভাসা চোখ। থুতনির নিচে চর্বি ঝুলছে। চৌকো মুখের এক কোণে মৃদু হাসি, আরেক কোণে মোটা চুরুট। তিন অফিসার একযোগে স্যালুট করল ব্রিটিশ চীফ অভ আর্মি স্টাফকে।

হাসি খানিকটা চওড়া হলো তাঁর। চুরুট বাঁ হাতে নিয়ে সিনিয়র দু'জনের সাথে হ্যান্ডশেক সেরে রাহাতের দিকে ফিরলেন। 'হ্যালো, ওয়ান্ডারবয়!' ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ!'

'মাই প্লেযার, স্যার!'

এক ঝাঁকি দিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন তিনি। 'সিট ডাউন, জেন্টলমেন!'

গুরু গম্ভীর হয়ে উঠল পরিবেশ। স্ট্রাইক ফোর্সের সমস্ত খুঁটিনাটি দিক নিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলল আলোচনা। ঠিক হলো, বাহিনীর সদস্য বাছাই এবং তাদের অ্যাডভান্সড ট্রেনিঙের যাবতীয় কাজ এককভাবে রাহাত করবে। পুরো স্বাধীনতা থাকবে ওর সে কাজে। যাকে উপযুক্ত মনে হবে, তাকেই কল করতে পারবে সে বিনা দ্বিধায়।

এরপর কাগজপত্রে সই করার পালা। কর্নেলের তৈরি করা

সমস্ত ডকুমেন্টস্ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন চার্চিল। তারপর সই করলেন, সীল মারলেন নিজের হাতে। আবার সব ফোল্ডার বন্দী হলো। দুটো বাদে অবশ্য।

তার একটা রাহাত খানের নতুন পরিচয় পত্র, অন্যটা 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' শিরোনামের বিশেষ চিঠি।

ইংল্যান্ডে তো বটেই; মিত্র যে কোন দেশে প্রয়োজনে ওটা দেখিয়ে সব ধরনের সাহায্য আদায় করতে পারবে রাহাত। চিঠি দুটোর জায়গা হলো ওর বুক পকেটে।

চার্চিলের শপথ নেয়ার ঠিক এক মাসের মাথায় জন্ম নিল ক্র্যাক কমান্ডো বাহিনী, 'স্ট্রাইক ফোর্স'।

'এই মুহূর্ত থেকে তুমি অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হলে, ওয়ান্ডারবয়,' বিদায়ের সময় ওর হাত ঝাঁকিয়ে বললেন বৃদ্ধ। 'এমন কি আমার চাইতেও বেশি ক্ষমতা এখন তোমার। মাই ব্লেসিঙস্।'

বুকের ভেতর অন্যরকম উত্তাপ নিয়ে বেরিয়ে এল রাহাত খান।

ছয় মাস পর। ১৭ ডিসেম্বর।

লন্ডন। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। বিচ্ছিরি অবস্থা। ওর মধ্যেই রাহাতকে ছুটে আসতে হয়েছে। মিশনে ছিল, ওটা শেষ হতে না হতে আবার ডাক।

ওই ডাকের অর্থ একটাই—আবার কাজ জমেছে কোথাও।

'তারপর?' কর্নেল বীকনকে থেমে যেতে দেখে প্রশ্ন করল ও।

মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন কর্নেল, এই সময় কাছেই কোথাও এয়ার-রেইড সাইরেন বেজে উঠতে থেমে পড়লেন। উঁচু-নিচু পর্দায় দু'মিনিট বেজে নীরব হয়ে গেল ওটা, তার একটু পরই অনেক দূরে মেঘ ডাকলে যেমন গুম গুম আওয়াজ হয়, তেমনি

গুরুগম্ভীর, টানা আওয়াজ উঠল।

লুফতওয়াফে!

অফিসরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রাহাত, হাতে কফির কাপ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিগুণ হয়ে উঠল আওয়াজটা, শত্রুকে বাধা দিতে ব্রিটিশ ফাইটার আকাশে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি, মেশিনগানের টানা গর্জন ও শক্তিশালী জেট এঞ্জিনের ছোটাছুটি চলল। কয়েকটা বোমা বিস্ফোরণের ধাক্কায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠল, তারপর ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল সব।

হিটলারের তথাকথিত 'ব্যাটেল অভ ব্রিটেন' ব্যর্থ হয়েছে, আকাশে নিজেদের কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত বহাল রাখতে পেরেছে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স। তবে লুফতওয়াফে হাল ছাড়েনি, যখন-তখন হামলা চালাচ্ছে। খবরের কাগজসহ অন্য সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম করে দেখাতে বলা হয়েছে, কিন্তু তেমন সুবিধে হচ্ছে না তাতে। চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। চারদিন আগে ব্যালহাম আন্ডারগ্রাউন্ড রেল স্টেশনে একটা মাত্র বোমায় কয়েকশো যাত্রী হতাহত হয়েছে জানতে পেরে উৎসাহ বেড়ে গেছে ওদের, ঘন ঘন আসছে এখন।

খানিক বিরতি দিয়েই আবার বাজতে শুরু করল সাইরেন। আওয়াজের ওঠা-নামা এবার বেশ দ্রুত—জরুরী। কফি শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখল রাহাত। অ্যাক-অ্যাক গানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

কপালের একপাশ চুলকালেন জেফরি আলেকজান্ডার বীকন। 'তারপর···সে যোগাযোগ করল আমাদের ওয়ারশ কন্ট্যাক্ট, আনার সাথে। দুজনেই ইহুদী, আগে থেকে চিনত পরস্পরকে। বিজ্ঞানী ওকে ইংল্যান্ড পালিয়ে আসার ইচ্ছের কথা জানায়। কিন্তু

পোল্যান্ড থেকে সরাসরি এদিকে আসা অসম্ভব বলে আনাকে আমি প্যারিসে জাঁ মারেকের সাথে যোগাযোগ করতে বলেছি। বিজ্ঞানীকে ওখানে পৌঁছে দেবে আনা, তারপর...'

বোমাবৃষ্টির তোড়ে চাপা পড়ে গেল কর্নেলের পরের কথাগুলো। যেন দৈত্যাকার দুরমুজ দিয়ে ঘন ঘন আঘাত করা হচ্ছে, এমনভাবে কাঁপছে মাটি। অফিসের জানালার কাঁচ কাঁপছে ঝন্ ঝন্ করে। মাথার ওপরে, কাছেপিঠেই কোথাও ছোটাছুটি করছে লুফতওয়াফের ঝাঁক।

ওগুলো হেইঙ্কেল বোমারু, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বুঝল রাহাত। হেইঙ্কেল ওয়ান ওয়ান এইট। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ও এক-আধটার দেখা পাওয়ার আশায়। ওগুলোকে পাঠিয়ে অনর্থক নিজেদের লোক আর সম্পদ ক্ষয় করছে জার্মান হাইকমান্ড। ওয়ান ওয়ান এইটের গতি বেশি নয়, পড়িমরি ছুটলেও বড়জোর আড়াইশো মাইল পর্যন্ত ওঠে। রাহাত নিঃসন্দেহে জানে, ওগুলোর বেশিরভাগই দেশের মুখ দেখবে না আর কখনও। টেমস নদীর মোহনা পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার আগেই ব্রিটিশ ফাইটার পাখির মত গুলি করে ফেলে দেবে।

একটুপর আবার নীরবতা নেমে এল শেষ বিকেলের হিমশীতল, জড়সড় লন্ডনের আকাশে। তুষারপাতের হার একটু বাড়ল।

'প্যারিস থেকে লোকটাকে এখানে নিয়ে আসবে তুমি,' আবার বলে উঠলেন কর্নেল। 'যে করে হোক।'

তাঁর বাড়ানো প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল রাহাত। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউ মনে হচ্ছে। নতুন কিছু আবিষ্কার করেছে নাকি?'

'হ্যাঁ। নতুন এক বম্বসাইট আবিষ্কার করেছে। তার মতে দুইশো থেকে চার হাজার গজের মধ্যে যে কোন লক্ষ্যে নির্ভুল

আঘাত হানতে পারে এই বম্বসাইট। একচুল এদিক-ওদিক হবে না।'

শ্রাগ করলেন কর্নেল। 'ওই জিনিস হাতে পাওয়া যে আমাদের জন্যে কতখানি জরুরী, বুঝতেই পারছ।'

'যদি তার ধারণা সত্যি হয়,' মন্তব্য করল ও।

'রাইট। আমার মনে হয় সত্যি। হয়তো তার দূরত্বের হিসেবে কিছু কমবেশি হতে পারে, তবে···আমরা যাতে ব্যাপারটা উড়িয়ে না দেই, সে জন্যে আন্না তার আগের দু'চারটা ছোটখাট আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়েছে।'

ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে এগিয়ে দিলেন কর্নেল। 'এই যে, এরমধ্যে আছে সে সব। চোখ বুলিয়ে নিয়ো পরে।'

কাছে টেনে নিল ওটা রাহাত, রেখে দিল।

একটানা 'অল ক্লীয়ার' সাইরেন বাজছে। অভয়বাণী শোনাচ্ছে নগরবাসীদের। কিন্তু এ মুহূর্তে আওয়াজটা অন্য কোন জগৎ থেকে আসছে মনে হলো ওর। জাগতিক নয়, আর কোন গ্রহের।

'সত্যি যদি জিনিসটা পিনপয়েন্ট বম্বিং করার মত কিছু হয়ে থাকে, তাহলে ওটা আমাদের পেতেই হবে, মেজর। এবং জেরি লুবানস্কিকেও। কেবল জয়ের জন্যে নয়, বরং এই সর্বনাশা যুদ্ধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করার জন্যে।

নীরবে মাথা দোলাল ও।

'হিটলার যদি জানতে পারে তার চ্যান্সেলরি হাউস বা ঈগলস নেস্টে দূর থেকে সরাসরি হিট্ করার মত মোক্ষম অস্ত্র আমাদের আছে, তাহলে কে জানে, কয়েক সপ্তার মধ্যে হয়তো সে নিজেই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেবে।'

শেষ হয়ে আসা সিগারেট অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মেজর।

'কি ভাবে কাজ করে এই ডিভাইস, সে ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন?'

'না,' মাথা নাড়লেন বীকন। 'কিছুই জানতে পারিনি। আনা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বলেনি। এড়িয়ে গেছে।'

'বর্ডার ক্রসের ভিসা হিসেবে জমা রেখেছে মনে হয়,' মন্তব্য করল ও।

হাসি ফুটল সিনিয়রের মুখে। 'আমিও তাই ভাবছি।'

কিছু সময় নীরবে কাটল। আঁধার হয়ে আসছে দেখে রূমে ঢুকল সেদিনের সেই সুন্দরী স্বর্ণকেশিনী। জানালার কালো রঙের ব্ল্যাক আউট পর্দা ভাল করে টেনেটুনে দিয়ে অল্প শক্তির বাতি জ্বেলে দিল। তার আগে ভেতরে আরও দু'কাপ কফি দিতে বললেন কর্নেল।

'জাঁ মারেককে তোমার যাওয়ার খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। সে জানিয়েছে আনাকে, উনিশ তারিখ সন্ধের পর বিজ্ঞানীকে নিয়ে প্যারিস পৌঁছবে মেয়েটা,' রাহাতের সামনের ফাইল দেখালেন থুতনি তাক্ করে। 'ওটায় জাঁ মারেকের যে ঠিকানা আছে, সেখানে যেতে হবে তোমাকে।'

অ্যাডভান্সড্ ট্রেনিঙের সময় বিভিন্ন দেশে 'স্ট্রাইক ফোর্সের' যত কন্ট্যাক্ট আছে, তাদের লম্বা তালিকা মুখস্থ করতে হয়েছে রাহাতকে। জানে, আনা ও মারেক ওদের পোলিশ এবং ফরাসী কন্ট্যাক্ট—লো লেভেল। মারেক একজন চোরাচালানী। দেশের চারদিকে যত চোরাপথ আছে, সব তার নখদর্পণে। পুলিসের খাতায় তার যে নাম ছিল, এখন তা জার্মানদের তালিকাতেও উঠেছে।

'পেপার্স তৈরি থাকবে তোমার। চ্যানেল পাড়ি দেয়ার বোটও। আশা করছি সমস্যা হবে না।'

কিছু না বলে ফাইল খুলল মেজর। ডুবে গেল ভেতরে।

কর্নেলের পি.এস কফি নিয়ে ঢুকতে কিছুক্ষণের জন্যে ধরায় ফিরল, তারপর ফের তলিয়ে গেল পোলিশ বিজ্ঞানী জেরি লুবানস্কির রাজ্যে।

আবার বাজতে শুরু করেছে সাইরেন। করুণ, বিষণ্ন শোনাচ্ছে এবার আওয়াজটা। ধ্বংস আর মৃত্যুর আগমনী বর্তা ঘোষণা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন।

অন্ধকার রাত। অসহ্য ঠাণ্ডা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, তার ওপর খাঁড়ার ঘার মত লক্ষ লক্ষ সোনামুখী সুঁই হয়ে নাকেমুখে বিঁধছে বরফহিম বাতাস। ভেজা কাপড় ভেদ করে একদম হাড়ের ভেতরের মজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

আঁধারের চাদর মুড়ি দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি ধরেছে খুদে এক ফিশিং বোট। কোন আলো জ্বলছে না। চালকের অনুমান আর কম্পাসের ওপর নির্ভর করে চলছে। যে কোন মুহূর্তে পানির তলা থেকে ভুশ করে মাথা জাগাতে পারে জার্মান ই-বোট, তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সতর্ক সে।

অর্ধেক পথ পেরিয়ে বোটের গতি কমাল চালক, কারণ কি বোঝার জন্যে তার দিকে তাকাল রাহাত। জবাবে আঙুল তুলে আকাশ দেখাল সে। মুখ তুলে তাকাল ও, বিশাল কালচে ছোপ ছাড়া কিছু নেই। ব্যাপার টের পেতে সময় নিল একটু। অনেকগুলো শক্তিশালী এঞ্জিনের ভারী গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পেল। একটু পর দেখা দিল পেট মোটা চুরুটের মত এক ঝাঁক ছোপ। লন্ডনের দিকে চলেছে জার্মান বোমারু বিমান বহর।

ওগুলো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা দিল আরেক ঝাঁক। ব্রিটিশ বোমারু, উল্টোদিকে যাচ্ছে ওরা পাল্টা সৌজন্য জানিয়ে আসতে। এঞ্জিনের আওয়াজ বেশ জোরাল এগুলোর, গতিও।

একসময় শেষ হলো পাড়ি, আঁধারের মধ্যে সামনে আরও গাঢ় আঁধারের আভাস পেয়ে বোঝা গেল ওটা জার্মান অধিকৃত ফরাসী মেইনল্যান্ড। এঞ্জিন অফ করে দিল চালক, পিঁপড়ের গতিতে তীরের দিকে এগোল। নিঃশব্দে, দ্রুতহাতে ওভারকোট, ট্রাউজার আর জুতো খুলে ফেলল রাহাত। সব দলা পাকিয়ে বগলে নিয়ে তৈরি হলো। অন্য হাতে একটা ক্যানভাস হোল্ড-অল।

খানিকটা এগোতে কিছুর সাথে ঘষা খেল বোট, থেমে পড়ল। আর যাওয়ার উপায় নেই। চালকের কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বো-র দিকে এগোল মেজর, যতটা সম্ভব তীরের কাছে পৌঁছে লাফ দিল। পানির ছোঁয়া লাগামাত্র ঠাণ্ডার অসহ্য কামড়ে মুহূর্তের জন্যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল ওর। সর্বনাশ! জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে পা। আতঙ্কিত হয়ে উঠল, লম্বা পায়ে ছলাৎ ছলাৎ পানি ছলকে ডাঙার দিকে ছুটল দিশেহারার মত।

দেহের ভর ধরে রাখা ও দুটোকে এখন পা মনে হচ্ছে না, রক্ত চলাচল সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার ফলে লাঠি বলে মনে হচ্ছে। এখন আর রাহাতকে বহন করছে না ওরা, বরং উল্টো। তীরে পৌঁছে বহু কষ্টে ট্রাউজার পরল ও, উলের মোজা দিয়ে মিনিট পাঁচেক জোরে জোরে দু'পা ডলতে চিন্‌চিনে একটা ব্যথার সাথে আবার চলতে শুরু করল রক্ত।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মোজা-জুতো পরে নিল ও। পিছনে তাকাল। বোট অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে। তবে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ ছাপিয়ে ওটার এঞ্জিনের গর্জন কানে আসছে। ভাগছে জানপ্রাণ নিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তীরের দিকে নজর দিল ও, চোখ দুটোকে দূরবীন বানিয়ে আঁধার ফুঁড়ে সামনে দেখার চেষ্টা করল। তেমন সন্দেহজনক কিছু নেই। কোন নড়াচড়া বা আর কিছু, কোনটাই নেই।

ধীর পায়ে, সতর্কতার সাথে এগোল মেজর ক্যানভাসের

হোল্ড-অলটা বাঁ কাঁধে নিয়ে। ওটার মধ্যে কিছু যন্ত্রপাতি আছে ওর ইলেকট্রিশিয়ানের পরিচয় জানান দেয়ার জন্যে, আর আছে একান্ত ব্যক্তিগত এটা-ওটা। প্যারিসের বড় এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সাথে ওর বাৎসরিক লাইন মেরামতী চুক্তির একটা কপিও আছে পকেটে, সেই সথে ফরাসী পরিচয়পত্র। দুটোই একদম খাঁটি মাল।

দু'মাইল দূরের এক রেল স্টেশনে যেতে হবে এখন, সেখান থেকে ট্রেনে প্যারিস। আরেকবার ভাল করে ডানে-বাঁয়ে, সামনে দেখে নিল রাহাত। জার্মান গার্ড পোস্ট নেই নাকি এদিকে? পায়ের নিচে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল একটা পাথরের টুকরো, আরও কয়েকটাকে ঠেলে গুঁতিয়ে ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নিয়ে চলল বিচিত্র শব্দ করতে করতে।

চট্ করে ওয়েস্ট ব্যান্ডে গোঁজা অস্ত্রটার বাঁটে হাত চলে গেল ওর। ল্যুগার প্যারাবেলাম পিস্তল ওটা। নির্ভুল লক্ষ্যভেদ করার জন্যে লম্বা ব্যারেল ফিট্ করা নেভাল ভার্সন—চমৎকার জিনিস। সেফটি ক্যাচ অফ করে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রাহাত, তারপর অন করে পা বাড়াল নিশ্চিন্তে।

কিনারায় উঠে বসে পড়ল। নইলে সামনে কেউ থাকলে আকাশের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখে ফেলবে ওকে। একটা সমতল, মসৃণ পাথরের ওপর হাতের ভর রেখে বসেছে রাহাত, খুব বেশি ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে ওটাকে। সচকিত হয়ে হাত সরিয়ে নিল হঠাৎ। পাথর! এত মসৃণ? সাবধানে ফের হাত বাড়াল, আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে দেখল ভাল করে। ঠাণ্ডা, মসৃণ, গোল এবং ধাতব...!

জমে গেল রাহাত, দম আটকে এল আপনাআপনি। কি ওটা? নিজেকে প্রশ্ন করল মনে মনে।

কেউ কিছু ফেলে গেছে? কিন্তু এমন ঠাঠা পড়া জায়গায়

কে-ই বা আসবে? নাকি পানিতে ভেসে এসেছে? হতে পারে না। ধরেই বোঝা গেছে জিনিসটা খুব ভারী। ভেসে আসার মত নয়। তাহলে আর একটাই সম্ভাবনা বাকি, এবং সেটাই সত্যি।

মাইন!

দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল মেজর, বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে। এক চুল নড়তে সাহস হচ্ছে না। যদি মাইনফিল্ডে এসে পড়ে থাকে ও অজান্তে, তাহলে নড়তে গিয়ে হয়তো মাটির তলায় পোঁতা আরেক মাইনের ওপর চড়ে বসতে পারে। নিশ্চই পূর্বপুরুষদের পুণ্যের জোর ছিল বলে বেঁচে আছে ও এখনও, ভাবল রাহাত, চোখে পড়ার জন্যেই বেরিয়ে ছিল যতদূত। নইলে এতক্ষণে ইন্নালিল্লাহ্ হয়ে যেতে পারত।

চোখ বুজল অনড় মেজর, একাদশ শতাব্দীর চীনা কবি ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাশালী তাও চু-ওয়েনের বিদ্যা প্রয়োগ করে সহজ হতে চেষ্টা করল। কাঁপুনি কমে এল একটু একটু করে, শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে উঠল। নিয়ন্ত্রণ ফিরে এল নিজের ওপর। আতঙ্ক মনের কুঠুরির একদম পিছন দেয়ালে গিয়ে ঠেকল, সহজ বিচারবুদ্ধি জুড়ে বসল সেখানে।

'কোন ভয় নেই,' নিজেকে শোনাল মৃদু গলায়। 'বরং চিন্তা করো লেটেস্ট জার্মান মাইন সম্পর্কে কি কি জানো তুমি।'

তেমন কিছু না। ম্যাগনেটিক মাইন আছে ওদের আর সব দেশের মত। প্রেশার মাইন আছে, আরও আছে ট্রেম্বলার মাইন, ইলেকট্রিক মাইন। কোনটা নড়াতে গেলে বিস্ফোরিত হয়, কোনটা হয় ধাতব কিছু কাছে এসে পড়লে। চাপ পড়লে ফাটে কোনটা। কিন্তু...এটা কোন্ জাতের?

তাও চু-ওয়েনের দীক্ষা বিশেষ কাজে আসছে না, এত শীতেও ফের ঘামতে শুরু করেছে রাহাত। চিকন ঘামে ভিজে

উঠেছে কপাল। তবু, এরমধ্যেও সময় সম্পর্কে সচেতন। জানে দেরি করার উপায় নেই। ভোরের প্রথম ট্রেন ধরতে না পারলে ঝামেলা হয়ে যাবে। বড় এক ঢোক গিলে হাঁটু গেড়ে বসল, মুখ যথাসম্ভব কাছে নিয়ে জিনিসটা দেখার চেষ্টা করল। হলো না।

আবার হাত বাড়াল। ধরে দেখল যে জন্যেই হোক, প্রায় আস্ত মাইনটাই জেগে আছে মাটির ওপর। ফুল সাইজ থালার মত। ওটার চারদিকে আলতো করে আঙুলের ডগা বোলাল, না, কোন কন্ট্যাক্ট পিন বেরিয়ে নেই। স্বাভাবিক, ভাবল. ও, সাগরের তীরে কন্ট্যাক্ট মাইন পেতে রাখার কোন যুক্তি নেই। ছোট ছোট পাথরের সংঘর্ষেও ফেটে যেতে পারে। এটা নিশ্চই প্রেশার মাইন হবে। ক্যারিয়ার বা ট্যাঙ্ক উঠে পড়লে তবে ফাটবে।

ডান হিপ পকেট থেকে নরম চামড়ার একটা খাপ বের করল রাহাত। ওটা থেকে বের হলো পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ পাতলা ব্লেডের এক স্টিলেটো, প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী ওর। এক চুল এক চুল করে পিছিয়ে এল। স্টিলেটোর ডগা দিয়ে নরম বালু খুব সাবধানে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পথ করে এগোতে থাকল সামনের দিকে। মাত্র বিশ গজ বালিয়াড়ি অতিক্রম করতে পুরু আধঘণ্টা লাগল ওর। পথে খালি একটা মদের বোতল আর দুটো বালি ভরা ক্যান ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না।

সামনেই তারকাঁটার বেড়া দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রাহাত। স্টিলেটো জায়গায় রেখে ঘাম মুছল কোটের আস্তিনে, তারপর হোল্ড-অল থেকে হেভি ওয়্যার কাটার বের করে বেড়া কাটতে লেগে পড়ল। চ্যানেলের ওপারের আকাশে আলোর আভা ফুটতে শুরু করেছে তখন। ইংল্যান্ডে ভোর হয়েছে, ফ্রান্সে হতে যাচ্ছে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল মেজর, বসে পড়ল জিরিয়ে

নেয়ার জন্যে। একই সাথে এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল কোন গার্ড নেই দেখে। ভীতি দূর হয়ে গেছে, এখন আবার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করেছে। উন্মুক্ত হাতে, নাকে-মুখে হুল ফোটাচ্ছে বাতাস। তবে সৌভাগ্য যে বৃষ্টি নেই, থেমে গেছে একটু আগে। ঘুরে বসে বেড়ার কাটাগুলো জুড়ল ও।

সতর্ক গার্ডের চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়বেই। যদি বেড়ার বেশি কাছে এসে টহল দেয়, নইলে নয়। তবু জুড়তে হলো দিনের আলো ফুটলেই যেন দূর থেকে কারও চোখে পড়ে না যায়, সেই জন্যে।

বাতাসকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ও। বালি নিয়ে খেলা করছে বাতাস, পিছনে ফেলে আসা পায়ের ছাপ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। উঠে পড়ল রাহাত, এই সময় কয়েক গজ বাঁয়ে কিছু একটা চোখের কোণে ধরা পড়তে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল।

তেকোনা একটা সাইন ওটা। কাঁটাতারের বেড়ার গায়ে ঝুলছে। বাতাসে বাড়ি খাচ্ছে ঠুন্ ঠুন্ শব্দে। পায়ে পায়ে সাইনটার দিকে এগোল ও, ভাল করে তাকাল। তেকোনা লাল বর্ডারের মাঝে সাদার ওপর কালো রঙে বড় একটা মাথার খুলি আঁকা ওটায়। নিচে গুণ চিহ্নের মত দুটো লম্বা হাড়।

তার নিচে লেখাঃ আখতুঙ-মিনেন (অ্যাটেনশন-মাইন)!

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেজর। বিড় বিড় করে বলল, 'এতক্ষণ পর বলছ সে কথা?'

ঘুরে দাঁড়াল, দ্রুত পায়ে এগোল রেল স্টেশনের দিকে।

তিন

গোড়ালি সমান নরম তুষারে ঢাকা পড়ে আছে প্যারিস। শীত লন্ডনের থেকে কিছু বেশিই মনে হচ্ছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়া তেমন নেই, পেভমেন্ট প্রায় ফাঁকা। দোকানপাট খোলা, তবে ভেতরে মালপত্র খুব কম।

পথে যে ক'জনকে দেখল রাহাত, সবার চোখেমুখে চাপা ভয় আর শঙ্কা। ভীষণ ব্যস্ত। নিতান্ত দায় ঠেকে ঘরের বাইরে আসতে হয়েছে, কাজ সেরে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে পারলে বাঁচে, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাবভঙ্গিতে।

ও নিজেও ব্যস্ত। জোর পায়ে হাঁটছে। বিখ্যাত ম্যাসিয়ন ক্ল্যান্ডি ওর গন্তব্য, জাঁ মারেকের অ্যাপার্টমেন্ট। দেশী বিশ্বাসঘাতক আর গেস্টাপোর ভয়ে এখন এখানে, তখন ওখানে করে বেড়াচ্ছে সে। জায়গামত তাকে পাওয়া যাবে কি না ভেবে চিন্তায় আছে রাহাত। পথে দু'বার জার্মান সৈন্যদের মুখে পড়ল, অবশ্য সমস্যায় পড়তে হলো না। বেশ সহজেই কাটিয়ে দিল।

ওদের চাইতে রাহাতের ফ্রেঞ্চ শতগুণ ভাল। যে ফ্রেঞ্চ ওরা জানে, তা স্রেফ কাজ চালাবার জন্যে 'ইয়েস নো ভেরি গুড' ধরনের। তাও কড়া জার্মান টানে বলে, বুঝে ওঠা অনেক সাধনার ব্যাপার। রাহাতের চোস্ত ফরাসী শুনে আর কাগজপত্র দেখে বিনা দ্বিধায় ছেড়ে দিয়েছে সন্দেহের কিছু নেই দেখে।

মনের পর্দায় এঁকে আনা পথঘাটের ম্যাপ অনুযায়ী হাঁটছে ও,

কাঁধে ক্যানভাসের হোল্ড-অল। খানিক পর পর কাঁধে আর ক্যাপে জমে ওঠা তুষার ঝড়ছে গা-মাথা ঝাঁকিয়ে। একসময় জায়গামত পৌঁছল রাহাত, রু ফ্রেসনেলের দক্ষিণ মাথার সরু, ছোট্ট রু ফউকাল্টে ঢুকল। অল্প কয়েকটা বাড়ি এটার দু'দিকে। ডানদিকের শেষ মাথার ষোলো নম্বর অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মারেক, অন্তত থাকার কথা। টপ ফ্লোরে। তার ওপাশে ছোট একটা খেলার মাঠ। মাঠের ও প্রান্তে আবাসিক এলাকা। বেশি নয়, বড়জোর ত্রিশ গজ দূরে।

ওদিকটা প্রায় ফাঁকাই বলা চলে এদিকের মত। পথচারী খুব অল্প। এক ছোটখাট লোকের ওপর চোখ পড়ল রাহাতের। মাঠের ও প্রান্তে টেলিফোন লাইনের কাজ করছে সে পোলের সাথে ঠেকানো খাটো একটা মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে। দৃশ্যটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে, ভাবল রাহাত। হাঁটার ফাঁকে চোখ কুঁচকে তাকাল, সরাসরি নয়, আড়নজরে।

নাহ্, বোঝা গেল না কিছু। তবু খটকা দূর হচ্ছে না, খচ্ খচ্ করছে মনের মধ্যে। কি হতে পারে ব্যাপারটা? ভাবতে ভাবতে মেইন গেটের কলিংবেল টিপল ও। দুপুর পেরিয়ে গেছে তখন। আকাশ মেঘলা, সীসা রঙের মেঘ ভাসছে। দু'পাশের বাড়িগুলোর লাল টালির খাড়া ছাদের আউটলাইন প্রকটভাবে ফুটে আছে তার গায়ে। চিন্তায় ঘন জোড়া ভুরু কুঁচকে আছে রাহাতের। খট্‌কা কাটছে না, দূরও হচ্ছে না।

ভেতর থেকে বোল্ট খোলার 'খটাং' শব্দে চমকে উঠল ও, ভারী কাঠের প্রকাণ্ড দরজা খুলে উঁকি দিল তরুণ কনশিয়ার্য। ওর মতই দীর্ঘ, তবে বয়স কুড়ির বেশি হবে না। বিস্মিত হলো রাহাত, এ পদে সাধারণত বুড়ো-বুড়িরা চাকরি করে জানত। এরকম তরতাজা জোয়ান...যুবকের প্রশ্নে সচকিত হলো ও।

'মঁশিয়ে?'

'মঁশিয়ে ফ্র্যাগোনার্ডের কাছে এসেছি আমি। উনি আছেন?'

সেকেন্ডের দশ ভাগের একভাগ সময়ের জন্যে সন্দেহের একটা ছায়া ফুটল যেন তার চোখের তারায়। পরক্ষণে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। বিনয়ের হাসি হেসে বলল। 'ও, হ্যাঁ! আছেন। টপ্ ফ্লোরে,' পথ থেকে সরে দাঁড়াল সে। 'আসুন।'

শেষবারের মত মাঠের ওপাশে চোখ বুলিয়ে ভেতরে ঢুকল রাহাত। 'ধন্যবাদ।' বাঁ দিকের স্টীলের গোল, প্যাঁচানো সিঁড়ির দিকে এগোল। স্যাঁতসেঁতে বাতাস ভেতরে। নিজের ধোঁয়ার মত নিঃশ্বাস পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও। ছয়তলায় উঠে সামনের একমাত্র দরজায় নক্ করল।

জবাব নেই।

আবার নক করল ও। 'মঁশিয়ে ফ্র্যাগোনার্ড?'

চাপা পায়ের আওয়াজ উঠল ভেতরে। 'কে?'

'আমি, পল!' গলা চড়িয়ে বলল ও কনশিয়ার্যকে শোনানোর জন্যে। 'ইলেক্ট্রিশিয়ান, মঁশিয়ে!'

ভেতরে চাবি ঘোরানোর শব্দ উঠল, তারপর বোল্ট খোলার। দরজা সামান্য মেলে ধরে তাকাল মারেক। এক মুহূর্ত পর পুরো মেলে ধরল পাল্লা। 'আসুন, প্লীজ!' সসম্মানে আহ্বান জানাল ওকে।

ঢুকে পড়ল রাহাত। মারেককে দেখল ভাল করে। সশরীরে দু'জনের এটাই প্রথম সাক্ষাৎ। তবে রাহাত সুবিধেজনক পর্যায়ে আছে, কারণ প্রত্যেক ইনফর্মারের চেহারা চেনা ওর। ছবি দেখে চিনেছে। নিখুঁত বর্ণনাও জানে। মনে মনে হাসল, মারেক এতই প্রভাবিত হয়েছে ওকে দেখে যে হোম টাস্ক ভুলে গেছে। কিন্তু এ লাইনে এই ধরনের ভুল খুবই বিপজ্জনক। 'কিছু ভুল হয়েছে বোধহয় আপনার,' গম্ভীর, ভরাট গলায় বলল ও। 'অসমাপ্ত রয়ে গেছে কিছু।'

টিপ টিপ করে পলক পড়ল তার চোখে। ভুরু কুঁচকে উঠছিল, হঠাৎ থেমে গেল। ভুল ধরে ফেলেছে। 'সরি। মনে ছিল না,'

নার্ভাস হাসি দিল সে।

রাহাতের চেহারায় কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। 'আমি মনে করিয়ে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, ইয়ে···আহ্, ক'টা বাজে?'

'দুঃখিত, আমার ঘড়ি বন্ধ।'

আরেকবার নার্ভাস হাসি দিল ফরাসী। হোল্ড-অল মেঝেতে রেখে ডান হাত বাড়াল মেজর। 'কোড বিনিময়ের সামান্য ভুলে অনেক বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'দুঃখিত। আর কখনও হবে না,' করিডরে দ্রুত নজর বুলিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল জাঁ মারেক।

'আপনাকে নার্ভাস লাগছে,' সোফার পাশ কাটিয়ে জানালার দিকে এগোল রাহাত। 'কোন সমস্যা হয়নি তো?' পর্দা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হয়ে উঠল চেহারা।

'আপনিও দেখেছেন তাহলে?'

ঘুরে তাকাল ও। 'কখন থেকে লেগেছে পিছনে?'

'আজ নিয়ে পাঁচদিন। কয়েক ঘণ্টা পর পর গিয়ে কাপড় বদলে আসে।'

ততক্ষণে খট্‌কা দূর হয়েছে রাহাতের, ওপর থেকে এক নজর দেখেই বুঝে ফেলেছে গোলমালটা কোথায়। মইয়ের ওপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা, চোখ সোজা এদিকে। তবে সে নয়, আসল গলদ হলো মই। ওটাই খোঁচাচ্ছিল।

নিচের কয়েক ধাপ বাদে মইয়ের প্রত্যেকটা ধাপে উঁচু হয়ে বরফ জমে আছে। প্রচুর বরফ। কোন সরু সারফেসে দুই-চার ঘণ্টাতেও এত জমতে পারে না। অথচ মানুষটার কাঁধে বা হ্যাটের তুষার ছাড়া ছাড়া। তার মানে একভাবে বাইরেই পড়ে আছে মই। নিচের কয়েক ধাপে নেই, কারণ ওগুলোয় পা রেখে উঠতে হয় তাকে।

'চেনেন লোকটাকে?'

মাথা ঝাঁকাল মারেক। 'গেস্টাপো ইনফর্মার। ভয়ে রাতে অন্যখানে ছিলাম আজ। আপনার আসার কথা বলে...'

'ওরা তাহলে আপনার বর্তমান পরিচয় জেনে ফেলেছে?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল রাহাত। আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল তাকে মাথা নাড়তে দেখে।

'না বোধহয়। তাহলে কি আর বসে থাকত?'

'তাহলে?'

বাইরে তাকাল ফরাসী। 'হয়তো কিছু সন্দেহ করেছে।' ঘরের এককোণে মেঝেতে রাখা একটা অয়্যারলেস সেট দেখাল। আঠারো তারিখ বিকেলে কর্নেল বীকনের সাথে কথা বলেছি অয়্যারলেসে, তারপর থেকে...'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রাহাত। 'ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'পরে দেখব,' কোট খুলতে খুলতে বলল ও। 'এতদিনেও যখন কিছু করেনি, মনে হয় আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে।'

ঘরের মধ্যে জ্বলতে থাকা বড় এক স্টোভের কাছে বসে পড়ল। ট্রাউজারের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। উত্তাপ পেয়ে দ্রুত কেটে যেতে শুরু করল হাত-পায়ের আড়ষ্টভাব।

'ড্রিঙ্কস?' বলল মারেক। 'কনিয়াক আছে।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'থ্যাঙ্কস।'

দুটো গ্লাসে অল্প করে পানীয় ঢেলে আনল সে। দুই ঢোকে শেষ করল রাহাত। প্রায় সাথে সাথে কাজ শুরু করল শ্যাম্পেন, টান্ টান্ পেশী শিথিল হয়ে এল, কমে গেল ভেতরের উদ্বেগ। একটুপর চেয়ার নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বসল ও, আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চোখ বোলাতে লাগল বাইরে।

চারটার দিকে উঠে পড়ল। আঁধার হতে শুরু করেছে। লোকটা তখনও একই জায়গায় আছে। মইয়ের ওপর নয় অবশ্য, রাস্তায়। হাঁটাহাঁটি করছে শীত কাটাবার জন্যে। 'আপনি থাকুন,'

ওভারকোট গায়ে চড়িয়ে বলল ও। 'আমি দেখছি।'

'আপনার একা যাওয়া ঠিক হবে?'

জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না রাহাত, বেরিয়ে এল। লোহার সিঁড়িতে শব্দ বেশি হয়, তাই পা টিপে নামতে শুরু করল। কনশিয়ার্য ছোকরাকে জানান দেয়ার ইচ্ছে নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলল ও, বাইরে এসে আস্তে করে টেনে ভিড়িয়ে রাখল। লম্বা করে দম নিল, তারপর পা বাড়াল মাঠের দিকে।

ওকে তার দিকেই এগোতে দেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল 'লাইনম্যান', ভুল বুঝতে পেরে আবার পায়চারি শুরু করল। অবশ্য সন্দেহের মেঘে চেহারা আঁধার। বোঝা যায় ইচ্ছে নেই, তবু বারবার মুখ তুলে ওকে দেখছে। মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখল রাহাত, শুভেচ্ছা জানানোর ভঙ্গিতে ডান হাত নাড়ল হাসিমুখে।

বাঁ হাতে ওভারকোটের দুই ল্যাপেল ধরা। বোতাম লাগায়নি। 'হ্যালো!' হাসি চওড়া হলো ওর। 'মাফ করবেন। আমার বন্ধু ওই অ্যাপার্টমেন্টের টপ্ ফ্লোরে থাকে। ওর টেলিফোন সেট কাজ করছে না, আপনি যদি...'

আকাশ থেকে পড়ল যেন লোকটা। 'টেলিফোন!' চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'টেলিফোন... কি?'

জমাট বেঁধে গেল রাহাতের হাসি। তার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। 'চিনতে পারলে না? থাক্ তাহলে। কিন্তু এটা চিনেছ তো?' বাঁ ল্যাপেল খানিকটা সরিয়ে ল্যুগারের বাঁট পেঁচিয়ে ধরল।

অস্ফুটে আঁতকে উঠল লোকটা, ওর চোখে খুনীর দৃষ্টি দেখে কলজে হিম হয়ে গেল। সভয়ে পিছিয়ে যেতে চাইছিল নিজের অজান্তেই, কিন্তু সুযোগ দিল না ও। চট্ করে আরেক পা এগিয়ে ডান বাহু পেঁচিয়ে ধরল। 'উঁহুঁ, নোড়ো না। ঘাবড়ে গিয়ে গুলি করে বসতে পারি আমি।' ওভারকোটের তলা দিয়ে ল্যুগারের নলের জোর এক খোঁচা মারল তার পাঁজরে। 'হাঁটো!'

'কো-কোথায়! কে আপনি?' বহু কষ্টে বলল লোকটা।

যেন রাহাতের সুবিধে করে দেয়ার জন্যেই হঠাৎ তুষারপাতের বেগ বেড়ে গেল। আঁধার করে চেপে বসল চারদিক থেকে। 'আমাকে চিনবে না তুমি। যা বলছি তাই করো, হাঁটো। তোমার সাথে কিছু আলাপ আছে।'

'কি-ক্কিসের আলাপ!' রক্ত সরে প্রায় বরফের মতই সাদা হয়ে উঠেছে তার চেহারা। 'আপনাকে চিনি না আমি। অপরিচিত...'

'তাই নিয়েই তো আলাপ করতে চাইছি,' অমায়িক হাসি দিল ও। 'পরিচিত হতে চাইছি। নাও, এগোও!'

পা বাড়াতে বাধ্য হলো লোকটা। তার বাহু ধরে ঘনিষ্ঠ হয়ে এগোল রাহাত, যেন কতকালের বন্ধু দু'জনে।

পথে তেড়িবেড়ি করল না 'লাইনম্যান', সুড়সুড় করে চলে এল। দরজা ঠেলা দিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল ও। দরজার শব্দে বেরিয়ে এল কনশিয়ার্য, লোকটাকে দেখে হাসির ভঙ্গি করল। 'মঁশিয়ে লাউবে! আপনি? কিন্তু মঁশিয়ে ফ্র্যাগোনার্ড তো...' ব্রেক কষল সে রাহাতকে ঢুকতে দেখে। বিস্ময়ে বদলে গেল চেহারা। 'আ-আপনি...!'

সুযোগ চিনতে ভুল হলো না লোকটার, খপ্ করে যুবকের কলার চেপে ধরল অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে, এক ঝট্‌কায় রাহাতের দিকে ঠেলে দিল তাকে, পরক্ষণে খিঁচে দৌড় লাগাল কাছের 'কনশিয়ার্য' লেখা খোলা দরজার দিকে। এত দ্রুত ঘটে গেল সব যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো ওর। কিন্তু চিন্তা করার সময় নেই তখন, হাত পিছনে নিয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, সে চেষ্টা বাদ দিতে বাধ্য হলো।

বাঁ হাত তুলে হুড়মুড় করে ছুটে আসতে থাকা যুবককে কনুইয়ের জোর ধাক্কায় সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চাইল রাহাত, কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগল না, লাগল কোনাকুনি, কানের পাশে। তাতে গতি বরং আরও বেড়ে গেল তার। ভারসাম্য যেটুকু বা

ছিল, হারিয়ে এলোমেলো পায়ে ছুটে গেল সরু হলরুমের ও মাথার এক টেবিলের দিকে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল। চাপা একটা মট্! আওয়াজ কানে এল রাহাতের। মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল যুবকের গলা দিয়ে, বেকায়দারকম বাঁকা ঘাড় নিয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে পরক্ষণে। এত কিছু ঘটে গেল মাত্র এক লহমায়।

তাকাল না রাহাত, লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটল। সে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে রুমে, তবে আতঙ্কের ছ্যাঁকা খাওয়া মস্তিষ্ক সঠিক কাজের গুরুত্ব বোঝাতে ব্যর্থ হলো তাকে সময়মত, আগে দরজা বন্ধ করবে না ছুটে আসা শত্রুকে নিজের অস্ত্র বের করে গুলি করবে, মহামূল্যবান আধ সেকেন্ড সময় নষ্ট করে ফেলল সে চিন্তার পিছনে। 'শার্দূল যখন ঝাঁপ দেয়, তখন অ্যাকশনের চিন্তা নয়, অ্যাকশন চাই বাঁচতে হলে,' ফরাসী হয়েও বিখ্যাত এক ফরাসীর এই মূল্যবান উপদেশটা হয়তো পড়া ছিল না।

অস্ত্র বের করার জন্যে ওভারকোটের বোতাম ধরে খাবলাখাবলি করে যখন বুঝল কাজ হবে না, ঝাঁপিয়ে পড়ে দরজা বন্ধ করতে চাইল লোকটা। কিন্তু ছক্ ততক্ষণে পাল্টে গেছে, পৌঁছে গেছে মেজর। প্রায় বুজে আসা দুই পাল্লার দরজার ওপর কাঁধ দিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল ও, কাঁচ এবং সরু ফ্রেম চুরমার করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ছোটখাট লোকটাও উড়ে গেল সে ধাক্কায়, চোখের পলকে ছোট রুম পেরিয়ে ওমাথার সিঙ্কের ওপর গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল। ওখান থেকে মেঝেতে। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে পড়ল পরক্ষণে, মরিয়া হয়ে বোতাম খোলার চেষ্টা করল।

'মরতে না চাইলে থামো!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল রাহাত। 'হোল্ড ইট!'

কে শোনে কার কথা! খুলে ফেলেছে একটা বোতাম, আরেকটা খুলতে পারলেই বিপদ। ও ব্যাটা লোক জড়ো করার

জন্যে হলেও নির্দ্বিধায় গুলি করতে পারবে, কিন্তু ওর সে উপায় নেই। নির্দয় হয়ে উঠল রাহাত, দুই লাফে পৌঁছে গেল কাছে, পরমুহূর্তে ডান জুতোর ডগা সজোরে ছুঁড়ল লোকটার থুত্‌নি সই করে। পর পর দুটো আওয়াজ উঠল খটাস্! ও ঠাস! করে–প্রথমটা ব্যাটার দু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষের, অন্যটা দেয়ালের সাথে মাথার।

চোখ উল্টে গেল তার, দু'হাত নেতিয়ে পড়ল দেহের পাশে। তারপর আস্তে করে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল দেহ।

নিশ্চিন্ত হয়ে এক লাফে হলরুমে ফিরে এল রাহাত। কাছ থেকে দেখেই বুঝল মরে গেছে কনশিয়ার্য। টেবিলের কোনায় লেগে ঘাড় ভেঙে গেছে। বুকের কাছে কোট মুঠো করে ধরে দেহটা টেনে নিয়ে চলল ও। মাথা শূন্যে ঝুলছে যুবকের, ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে সুতোয় বাঁধা নারকেলের মত। লাশটা অজ্ঞান লাউবের পাশে রেখে হাঁপাতে লাগল।

কোথাও পায়ের শব্দ ওঠে কি না শোনার জন্যে কান খাড়া। না, কেউ টের পায়নি তাহলে। পুরো বাড়ি নীরব। অন্য সব ফ্ল্যাট খালি নাকি? সামনের দরজা খোলা খেয়াল হতে বেরিয়ে এসে লাগিয়ে দিল ও। ইনফর্মার লোকটা তখনও বেঁচে আছে। ঘাড়ের একটা রগ লাফাচ্ছে তার। মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে একনাগাড়ে। আর বেশিক্ষণ নেই, বুঝতে পারছে রাহাত। মরল বলে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে রুমের সস্তা লাইনোলিয়াম। দেহ দুটোর কি ব্যবস্থা করা যায় ভাবছে, এই সময় লোহার সিঁড়িতে চাপা পায়ের শব্দ উঠল।

চট্ করে দেয়ালে সেঁটে দাঁড়াল ও, ল্যুগার ধরা ডান হাত দেহের পাশে ঝুলছে। বাইরে সন্ধে হয়েছে, ভেতরের আলো জ্বালা হয়নি, কাজেই ভয়ের কিছু নেই ভেবে উঁকি দিল। তখনই ফস্ করে ম্যাচের কাটি জ্বালল কেউ সিঁড়ির একদম শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে। হাঁপ ছাড়ল রাহাত, জাঁ মারেক।

হলরুমের আলোর সুইচ আগেই দেখেছে রাহাত, হাত বাড়িয়ে

ওটা টিপে দিল। চমকে উঠল মারেক, ওকে দেখে চোখ কোঁচকাল। 'কি ব্যাপার, আপনি ওখানে কি করছেন?'

ইশারায় কাছে ডাকল ও। এগিয়ে এল লোকটা। ভেতরের দৃশ্য দেখে চোখের কোণ সামান্য কুঁচকে উঠল কেবল, আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। 'কি ঘটেছিল?'

বলল ও সংক্ষেপে। শুনে আবার চোখ কোঁচকাল ফরাসী, কনশিয়ার্যের মৃতদেহের দিকে তাকাল বিস্মিত দৃষ্টিতে। 'এই লোকও!'

'কথা শুনে তাই তো মনে হলো।' একটু ভাবল ও। 'এখানে এদের ফেলে রাখা ঠিক হবে না। আর কোথায় রাখা যায়?'

'স্টোররুমে,' বিন্দুমাত্র দেরি না করে জবাব দিল মারেক।

'কোথায় সেটা?'

সিঁড়ির পিছনে, হলরুমের শেষ মাথার একটা বন্ধ দরজা ইঙ্গিত করল সে। 'বিল্ডিঙ ম্যাটেরিয়াল রাখা হয় ওর মধ্যে। অন্তত আজকের রাতের জন্যে নিশ্চিন্তে ওখানে রাখা যায় এদের।'

কাজে লেগে পড়ল ওরা। অন্য কেউ হলে হয়তো রাহাতের মনে অনুশোচনা জাগত। কিন্তু এদের দু'জনের বেলায় কিছুই জাগল না। সামান্য করুণাও না। একটা গেস্টাপোর চর, অন্যটা তার দোসর, তারওপর দুটোই ফরাসী। এই প্রজাতির মৃত্যুতে দুঃখ করার কোন কারণ নেই।

অবশ্য অন্য আফসোস একটা থেকেই গেল—কিছুই জানতে না পারার আফসোস। কয়েকবার ওর প্রশ্নের জবাব দিতে মুখ খুলেছিল লোকটা, কিন্তু রক্ত আর ফেনা ছাড়া কিছু বের হয়নি মুখ দিয়ে।

আটটার দিকে অজ্ঞান অবস্থায় মারা গেল সে।

রাত সোয়া ন'টায় জাঁ মারেকের সাথে দেখা করতে এল অচেনা এক যুবক। পোলিশ, নাম লবকোউইস্কি। আনার বয়ফ্রেন্ড। একাই

এসেছে, আনা বা জেরি লুবানস্কি আসেনি। ওরা দু'জনেই ধরা পড়েছে গেস্টাপোর হাতে।

আনা ধরা পড়েছে তিনদিন আগে, বিজ্ঞানী তারও ছয়দিন আগে।

'কোথায় রাখা হয়েছে ওদের?' চোখ বুজে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে প্রশ্ন করল মেজর রাহাত। ভীষণরকম অন্যমনস্ক।

'ওয়ারশর একশো ষাট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের ওসওয়েসিম নামের এক গ্রামে। জার্মান কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প...'

বাকি কথা কানে গেল না মেজরের। দম আটকে আসছে, মনে হচ্ছে একটা ইস্পাতের ঠাণ্ডা হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে ওর হৃৎপিণ্ড। পোলিশে ওটার নাম ওসওয়েসিম, ইংরেজিতে অসউইজ, আর জার্মানে অশউইৎজ। ওই ক্যাম্প সম্পর্কে কিছু কিছু জানা আছে রাহাতের। বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ওটা, তিন মিটার উঁচু ডবল কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চব্বিশ ঘণ্টা হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ...। ওখান থেকে কি করে বের করবে ও লোকটাকে?

'যাহ্!' চেহারায় হতাশা ফুটল জাঁ মারেকের। 'এখন তাহলে আপনার ফিরে যাওয়া ছাড়া কোন পথ নেই দেখছি।'

হাতেরটা ফেলে আরেকটা ধরাল রাহাত খান। হাত কাঁপছে একটু একটু। 'খালি হাতে ফিরে যাব বলে আসিনি আমি।'

'কি বলছেন! শোনেননি কোথায় রাখা হয়েছে ওদের?'

'শুনেছি।' নিজের মুখের ওপর ওদের বিস্ফারিত দৃষ্টি লেপ্‌টে আছে টের পেয়ে ঘুরল ও, পালা করে দু'জনকে দেখল ঠাণ্ডা চোখে। 'মিশন আনফিনিশড্ রেখে ফিরছি না আমি। আপনারা ওখানে পৌঁছতে সাহায্য করুন আমাকে। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ওদের বের করে আনতে হবে।'

চার

রাত ন'টার পর প্যারিসের রাস্তায় বের হওয়া ভীষণ বিপজ্জনক, তবু বেরুতে হবে। লাউবের রিলিভার কেউ আছে কি না জানে না মারেক। না থেকে থাকলে ইমিডিয়েট সুপিরিয়র কেউ নিশ্চই আছে, নির্দিষ্ট সময় পর তাকে রিপোর্ট করতে হয়। সে সময়মত খবর না পেলে সন্দেহ করে বসতে পারে। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে সে ক্ষেত্রে।

কাজেই সরে পড়তে হবে। অয়্যারলেস সেটসহ নিজের একান্ত জরুরী জিনিসপত্র গুছিয়ে বড় এক ব্যাকপ্যাকে ভরল জাঁ মারেক, বেরিয়ে পড়ল ওদের নিয়ে। পেশাদার চোরাচালানী সে, পুলিসের খাতায় নাম আছে অনেক আগে থেকে, নিজেকে বাঁচানোর পাল্টা ব্যবস্থাও তাই নিয়ে রেখেছে লোকটা। প্যারিসে নামে-বেনামে তার কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট, ওর একটার উদ্দেশে রওনা হলো। রু ডি চালট জায়গাটার নাম। ছোট দুই রূমের বেজমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট।

বরফমোড়া সরু সরু গলি ঘুঁচি ধরে নিঃশব্দে এগোল তিনজনের দলটা। তুষারপাতের পরিমাণ আবার বেড়েছে। তেরছা হয়ে পড়ছে। দশ মিনিট একটানা হেঁটে জায়গামত পৌঁছল ওরা।

নিজের দুই সহকারী থাকে ওখানে, লোক দুটোর সাথে নিচু গলায় মিনিট দুয়েক কথা বলল মারেক, নীরবে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে গেল তারা। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল ফরাসী। 'খুব খিদে লেগেছে। দেখি খাবার কি

আছে,' কিচেনের দিকে চলে গেল।

পোলিশ যুবককে নিয়ে সামনের রুমে বসল রাহাত, বিজ্ঞানী আর আনার গ্রেফতারের ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। ডিম, আলু আর পেঁয়াজ ভাজার গন্ধে ভরে উঠল ঘর। খিদেয় পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠল রাহাতের, খেয়াল হলো সারাদিনে পেটে তেমন কিছু পড়েনি আজ।

'আপনি বলছেন বিজ্ঞানীর গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়া দুর্ঘটনা?' ঝুঁকে বসল ও। 'ওরা তার গুরুত্ব না জেনেই ধরেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল লবকোউইস্কি। 'সেদিনের রেইড ছিল রুটিন রেইড, চোরাচালানী আর সো-কলড্ সন্দেহভাজন ইহুদীদের ধরার। ওরকম রেইড প্রায়ই হয়, সব মহল্লায়। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজনকে ধরেছে সেদিন গেস্টাপো, তিন-চারজনকে গুলি করে মেরেছে।

কালো রুটি, ওমলেট, অনিয়ন রিঙ, পটেটো চিপস্ আর কফি নিয়ে ফিরল জাঁ মারেক। দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। খিদের পেটে এই সামান্য জিনিসগুলোই রাজসিক মুঘল খানা মনে হলো রাহাতের। খাওয়া সেরে কফিতে চুমুক দিল নীরবে। আবার প্রশ্ন করতে শুরু করল।

'গেস্টাপো লুবানস্কির গুরুত্ব জানে না, আপনি শিওর?'

মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'ঠিক সেই অর্থে বলিনি আমি। তার গুরুত্ব ওরা সবাই না হোক, অন্তত গেস্টাপো চীফ জানে। সে নাকি এখনও তাকে খুঁজছে।'

জোড়া ভুরু কুঁচকে উঠল মেজরের। 'কি রকম?'

'ওয়ারশর গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সের কাছে লোকাল পুলিস ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড অফিস, ওখানে চাকরি করে এক মেয়ে। সে মাঝেমধ্যে ভেতরের খবর দেয় আমাদের।'

'তো?'

'রোজ প্রচুর ইহুদীকে গ্রেফতার করে গেস্টাপো। আর তাদের

নামের তালিকা তৈরি হয় এই মেয়ের অফিস থেকে। লুবানস্কি ধরা পড়েছে গত ১৫ তারিখ, ওই দিনের নামের তালিকা এখন তৈরি হচ্ছে। ওটা যখন ওদের চীফের চোখে পড়বে, তখনই সে বুঝবে কাকে ধরেছে ওরা।'

'আই সী!' একটু আশার আলো দেখতে পেল রাহাত। যতদিন ওরা লোকটার গুরুত্ব না জানছে, ততদিন সাধারণ বন্দীর মতই ট্রীট করবে তাকে, অর্থাৎ···দ্রুত কিছু হিসেব কষল ও। 'আনা ধরা পড়ল কি ভাবে?'

'একইভাবে। জালে আটকা পড়ে।'

'গেস্টাপোর সন্দেহের তালিকায় ওর নাম আছে?'

মাথা দোলাল লবকোউইস্কি। 'জানি না। নেই মনে হয়।'

'আপনাকে কে বলেছে প্যারিসে খবর দেয়ার কথা?'

'পুলিস রেকর্ডের সেই মেয়ে,' রাহাতের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখে বিব্রত চেহারা হলো তার। 'গ্রেফতারকৃতদের নাম রেকর্ড করার জন্যে ওদেরকেই যেতে হয় গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সে। ওখানে তাকে এক ফাঁকে বলেছে আনা।'

কিছু ভাবল রাহাত। 'লুবানস্কির ব্যাপারটা কতদিনে জানাজানি হতে পারে মনে হয় আপনার?'

'এক সপ্তার আগে অন্তত নয়। আরও বেশিও লাগতে পারে।'

'এতদিন···!'

'আর কদিন পর ক্রিসমাস। গেস্টাপো অফিসারদের অনেকেই দেশে যাবে। এরমধ্যে লিস্ট চেক্ করা হবে বলে মনে হয় না।'

তাই তো! ভাবল রাহাত, চমৎকার একটা সুযোগ।

'কিছু করার আগে লন্ডনের সাথে কথা বলে নিলে হত না?' বেশ দ্বিধার সাথে বলল জাঁ মারেক।

পাত্তা দিল না ও। 'কোন দরকার নেই। পরিস্থিতির গুরুত্ব ওঁরা বুঝবেন।' আবার কিছু ভাবল চোখ কুঁচকে। 'পোলিশ কাগজপত্র দরকার আমার, জোগাড় করে দিতে পারবেন কালকের

মধ্যে?'

'আশা করি,' মাথা দোলাল ফরাসী।

'গুড!' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রাহাত। সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

অন্য দু'জন নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ওর নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে।

ওয়ারশ, পোল্যান্ড। কনউইতোরস্কা স্ট্রীট।

অ্যাসিসটেন্ট চীফ অভ দ্যা কালেকশন অ্যান্ড রেকর্ড অফিসের প্রধান মাঝবয়সী এক মেজর। কাঁধের ওপর ঘাড় বলে কিছু নেই, আছে কেবল ফুটবলের মত গোল মাথা। নাকের খুব কাছ ঘেঁষে থাকা দু'চোখে ফুটে থাকে সার্বক্ষণিক কামাতুর দৃষ্টি। ভেজা ভেজা গোলাপী ঠোঁট দেখলে রি রি করে গায়ের মধ্যে।

অফিস ছাড়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে, এমন সময় তার জুনিয়রকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলল। দু'হাত চিৎ করে আট আঙুল পরস্পরের মধ্যে ভরে তলপেটের কাছে ধরে রয়েছে সে, তার ওপর কম করেও আড়াই ফুট উঁচু হয়ে আছে ফাইলের পাহাড়। কাৎ হয়ে যুবকের বুকে হেলান দিয়ে আছে।

গুঙিয়ে উঠল সহকারী প্রধান। 'রক্ষা করো মা মেরি! কি যন্ত্রণা নিয়ে এলে আবার? আমি তো ভেবেছি সব চেক্ করা শেষ হয়ে গেছে।'

থুতনি পাহাড়ের ওপর জাগিয়ে হাসির ভঙ্গি করল অল্পবয়সী জুনিয়র। সব সময় দুর্ব্যবহার করে বলে বসকে দু'চোখে দেখতে পারে না। হাসিতে সহানুভূতি ফোটাবার চেষ্টা থাকলেও মনে মনে আর কিছু ভাবছে যুবক। এ আর কি! আরও আছে, রোসো, ক্রিসমাসের ছুটি যাতে এবার তোমার কপালে না জোটে, সেই ব্যবস্থা করছি।

'দুঃখিত, স্যার!' মুখে বলল। 'কিন্তু হের নিউম্যান নির্দেশ

দিয়েছেন এগুলো আরেকবার খুব ভাল করে চেক করতে। কোন ব্রিটিশ গুপ্তচর ধরা পড়েছে কি না শিওর হতে চান তিনি। তাড়াতাড়ি।'

জুনিয়রের সামনে মনের ভাব প্রকাশ করায় বিপদ আছে, তাই নীরবে যা মুখে এল, তাই বলে নিউম্যানকে খানিক তুলোধোনা করল লোকটা। 'ঠিক আছে, রাখো এখন। কতদিনের রেকর্ড এখানে, কোন্ তারিখের? পনেরো তারিখের পরের নয় নিশ্চই?'

ভেতরের উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে যুবকের। হাসি ঠেকাতে পারছে না, তবু ঠেকাতে হলো। কোনমতে বলল, 'স্যার, বারো থেকে পনেরো, এই চার দিনের সবগুলো। আরও আছে, কাল নিয়ে আসতে হবে। হের নিউম্যান আপনাকে নিজেকে চেক্ করে দেখতে বলেছেন সব। আগামী সোমবার, তেইশ তারিখ ফেরত দিতে হবে।'

চোখ ধীরে ধীরে কপালের দিকে রওনা হলো সহকারী প্রধানের। 'গুড গড! সে তো কয়েক ডজন, না, কয়েকশো হবে।'

'জ্বি, স্যার। চারশো আঠারোটা।'

'হাসছ কেন উজবুকের মত!' ধমকে উঠল সে। 'আজ সতেরো তারিখ গেল, মাঝে মাত্র চারদিন, এরমধ্যে চারশো ফাইল...?'

'চারশো আঠারোটা, স্যার;' গোবেচারা চেহারা করে বলল জুনিয়র।

'অফিস আর মাত্র দু'দিন পর ছুটি হয়ে যাবে,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল মেজর। 'এতগুলো ফাইল চেক্ করা সম্ভব?' চোখ তুলল। 'সব সিরিয়াল অনুযায়ী আছে তো?'

দ্বিধা ফুটল যুবকের চেহারায়। 'ওয়েল, স্যার, সিরিয়ালিই ছিল। কিন্তু...'

'কিন্তু কি?'

'আসার পথে করিডরে হোঁচট খেয়ে...মানে পড়ে গিয়েছিলাম

আমি। ওলট পালট হয়ে গেছে···মানে, সব নয়, স্যার, অল্প কয়েকটা আর কি!'

হাসি ফুটল মেজরের গোলাপী ঠোঁটে। এই অতি চালাক গোছের ছোকরাকে তারও বিশেষ পছন্দ নয়। 'আচ্ছা, আচ্ছা! ভারি লজ্জার কথা, লেফটেন্যান্ট, এখনও তুমি ডুডু খাওয়া বাচ্চাদের মত হাঁটতে-চলতে আছাড় খাও!'

'স্যার, আমি···'

'দ্যাট'স অল রাইট, লেফটেন্যান্ট,' হাসি আরও চওড়া হলো মেজরের। 'অজুহাত শুনতে চাই না, চাই কাল সকালে অফিসে এসে যেন সব ইন-অর্ডার পাই আমি। বুঝতে পেরেছ?'

'স্যার···'

'কাল, ঠিক সাড়ে আটটায়।'

'কিন্তু, স্যার, আমার···'

টেবিলে ধুম্ করে কিল মেরে তাকে থামিয়ে দিল সহকারী প্রধান। 'যদি না পাই, তোমার বীচি দিয়ে ডোর-নকার বানাব আমি, বোঝা গেছে?' ক্যাপ মাথায় চাপাল। 'গুড নাইট, লেফটেন্যান্ট। আমার অফিস ব্যবহার করতে পারো তুমি।'

অ্যাটেনশন হয়ে গেল জুনিয়র, বস্ বেরিয়ে যেতে জঘন্য কিছু গালি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। আগেরবার উরসুলাকে কথা দিয়ে যেতে পারেনি সে সময়মত, আজও পারবে না। দেরি হয়ে যাবে অনেক। নিশ্চই ভুল বুঝবে মেয়েটা, রেগে যাবে। কিন্তু···পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে 'কি আর করা!' গোছের অসহায় ভঙ্গি করল সে। মেজরের চেয়ারে বসে সব কাছে টেনে আনল।

কয়েক রঙের ফাইল আছে ওর মধ্যে—নীল, সবুজ, সাদা আর হলুদ। রঙ অনুযায়ী হলে সাজাতে দু'মিনিটও লাগত না। কিন্তু ওর মধ্যে নম্বরের ব্যাপার আছে। সেটাই আসল। নীল ফাইল পুরুষদের, সবুজ মেয়েদের। শিশুদেরগুলো হলুদ, এবং রেইডের সময় যারা মারা যায়, তাদের সাদা।

শেষেরগুলো অল্প দেখে ওগুলোই আগে বাছাই করতে বসল লেফটেন্যান্ট। মনে মনে বলল, বেঁচে গেলে তোমরা। একবারে শেষ হয়ে গেছে ঝামেলা। অন্যদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

ওসওয়েসিমের কথা ভাবল সে, ওখানকার নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের কথা ভাবল। ওরা ওটাকে সংক্ষেপে কে.জেড বলে। শিউরে উঠল যুবক। মাত্র চারদিনে চারশোরও বেশি বন্দী, আগের কয়েক হাজারের সাথে এত মানুষ ওখানে থাকবে কি করে? ওটার সম্প্রসারণের কাজ চলছে, জানে সে। তাই বলে এত বন্দী ধারণ করার ক্ষমতা কে.জেডের থাকার কথা নয়। ওটার কাছের এক গ্রামে লেফটেন্যান্টের খালা থাকে, গতমাসে তার সাথে দেখা করতে গিয়ে দূর থেকে ক্যাম্পটা দেখেছে সে।

তাই জানে, রোজ যে হারে বন্দী পাঠানো হয়, তার সিকি ভাগেরও জায়গা হওয়ার কথা নয় ওখানে। তাহলে? কোথায় যায় এত মানুষ?

করিডরে জার্মান এসএস গার্ডের ভারী বুটজুতোর আওয়াজ শুনে চমকে উঠল অন্যমনস্ক লেফটেন্যান্ট। শুরু হয়ে গেছে ওদের টহল! গুন্ গুন্ করে ক্রিসমাসের আগমনী গান গাইছে লোকটা।

'স্টিলি নাখ্ট, হাইলিজি নাখ্ট (নীরব রাত, দীর্ঘজীবী রাত)।'

ওয়ারশ। ২২ ডিসেম্বর। পুরো শহর, পুরো দেশ মুঠোয় পুরে নিয়েছে পুব ইওরোপের জেনারেল উইন্টার। মাঠঘাট, ফসলের খেত, মরা গাছের ডাল আর ঘরবাড়ির ছাদ সব তলিয়ে গেছে বরফের তলায়। যেদিকে চোখ যায় কেবল সাদা আর সাদা।

মাঝারি গতিতে শহর ঘুরে এগোল মেজর রাহাতের ট্রেন। সকাল হয়েছে বেশ আগে। কম্পার্টমেন্টের অনেক যাত্রীর ঘুম ভাঙেনি এখনও। গরম পোশাকের উষ্ণ আড়ালে গুটি সুটি মেরে আছে। কিন্তু ও ঘুমাতে পারেনি। পুরো দুটো দিন কেটেছে ট্রেনে। দফায় দফায় জার্মান চেক পয়েন্টের মুখে পড়তে হয়েছে।

তবে সমস্যা হয়নি। বাধা যত কঠিন হয়, বাধা ভাঙার বিভিন্ন কৌশলও ততই শাণিত হয়। প্যারিস আন্ডারগ্রাউন্ডের এক ওস্তাদ এমনই কৌশল প্রয়োগ করেছে রাহাতের নতুন কাগজপত্রে, লবকোউইস্কির দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী খোদ দানযিগের অধিবাসী জার্মান বানিয়ে দিয়েছে ওকে। পোল্যান্ডের কল্‌জের মধ্যে হলেও ওখানকার স্থায়ী জার্মান কমিউনিটির কথা কে না জানে? জার্মান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে রাহাত, জার্মান কাগজপত্রই সবচেয়ে নিরাপদ হবে মনে হয়েছে ওর।

হয়েছেও তাই। প্রত্যেকটা চেক পয়েন্টে খুব দ্রুত খালাস দেয়া হয়েছে হের জোহানকে। তবু ঘুমাতে পারেনি ও ভেতরের অনিশ্চয়তা আর চাপা উত্তেজনার কারণে।

গতি কমে এল ট্রেনের, শহরে ঢুকছে। অলিগলির মুখে অজস্র উলঙ্গ লাশ ঝুলছে দেখল ও। কাঠের মত ঠক্ ঠক্ শব্দে বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সাথে। মাথায়, কাঁধে জমে থাকা বরফ ঠোকাঠুকির ফলে খসে খসে পড়ছে। মেইন স্ট্রীটের পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে এখন ট্রেন। ওটাও বরফে মোড়া। এরই মধ্যে এখানে-ওখানে লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ। রুটি, দুধ, ময়দা, কয়লা ইত্যাদি চাই।

অজস্র ক্ষুধার্ত ইহুদী দেখতে পেল রাহাত, লোভীর চোখে দোকানের ভেতরে সাজিয়ে রাখা খাবার দেখছে। যদিও অল্পই আছে ওসব। নামার সময় ইচ্ছে করেই দেরিতে নামল ও। পোল্যান্ডের বাইরে নিজেকে যত সহজে দানযিগের লোক বলে চালানো সহজ, এখানে ততটা নাও হতে পারে। পোলিশ গার্ডও আছে এখানকার গেটে। পাস চেক্ করতে করতে যখন বিরক্তি ধরে গেল ওদের, একঘেয়েমিতে পেয়ে বসল, তখন বের হলো। এবং ব্যারিকেড পেরিয়ে এল মাত্র দু'মিনিটে।

কনউইতোরস্কা স্ট্রীটের যে মাথায় পুলিসের রেকর্ড অফিস, তার উল্টোদিকের এক বাড়িতে ওকে নিয়ে এল লবকোউইস্কি।

ওয়ারশ স্টীল প্ল্যান্টের এক শ্রমিকের বাসা—লোকটা পোলিশ রেজিস্টেন্স মুভমেন্টের সদস্য। ড্রিউনস্কি। পরিচয় পর্বের পর তাকে রাহাতের আসার কারণ জানাল লবকোউইস্কি।

বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বসে থাকল ড্রিউনস্কি। মনে হলো মাথার এঞ্জিন ঠিকমত কাজ করছে না। দু'চোখ রাহাতের মুখের ওপর স্থির। হুঁশ ফিরতে মহাব্যস্ত হয়ে উঠল। নাস্তার ব্যবস্থা করে বাকি আয়োজন সারতে বেরিয়ে পড়ল তখনই। লবকোউইস্কিও গেল তার সাথে। রাহাত বসল ওয়ারশর এক ডিটেইলড্ ম্যাপ নিয়ে।

দুপুরের আগে ফিরে এল লবকোউইস্কি। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসে পড়ল দু'জনে।

তিনটের দিকে ওকে বের হওয়ার জন্যে তৈরি হতে দেখে, বিস্মিত হলো লবকোউইস্কি। 'কোথাও চললেন নাকি?'

'হ্যাঁ। ঘুরে দেখে আসি আপনাদের শহরটা।'

'সেটা কি ঠিক হবে? অচেনা জায়গা, কেউ যদি...'

'চিন্তা করবেন না,' মৃদু হাসল রাহাত। 'দূরে কোথাও যাব না আমি। টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা সেরেই ফিরে আসব।'

'সাবধান, মিস্টার...'

হাসল মেজর। মাথা দোলাল। 'উঁহুঁ, জোহান। হের জোহান।'

বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে বেড়াল খানিকক্ষণ। মধ্যবিত্ত পোলিশদের দুরবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগল ওর। বউ-মেয়েরা সব বাজারে চলে এসেছে, পথের পাশে দাঁড়িয়ে গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় এটা-ওটা বিক্রি করছে আরও একটা দিন টিকে থাকার জন্যে। বেবি সাইকেল, প্যারাম্বুলেটর, পশমী পুলওভার, স্কার্ফ, সিগার কাটার শখের গিলোটিন, পোষা কুকুর-পাখি, আরও কত কী!

আফসোস হলো রাহাতের। একদিন সবই ছিল এদের, এখন পথের ফকির। যা আছে সব বেচা হয়ে গেলে কি করবে এরা? তখন হয়তো দেহ ব্যবসায় নামতে হবে। আর উপায় কি? আস্তিনে

টান পড়তে ধক্ করে উঠল ওর বুকের মধ্যে, ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ভয়ের কিছু নেই দেখে।

এক হাড় জিরজিরে বুড়ি টেনে ধরেছে। কোলে ফুলের মত নিষ্পাপ এক শিশু ঘুমিয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে। বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষছে চোঁ চোঁ শব্দে। হয়তো নাতি-পুতি হবে বুড়ির।

'প্রোজেস (প্লীজ)!' ক্ষীণ কণ্ঠে বলল সে কঙ্কালের মত ডান হাত বাড়িয়ে। সোনার চেইনসহ সুদৃশ্য একটা পকেট ঘড়ি রয়েছে তালুতে। হয়তো ওর চোখে সমবেদনার ছাপ দেখেছে বুড়ি, চোখ দিয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। কি সব বলতে লাগল গড় গড় করে। মর্ম উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হলো মেজরকে। শিশুটি তার নাতি, বলল সে, একমাত্র মেয়ের প্রথম সন্তান। ওর মা-বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে গেস্টাপো, মেয়েটি দু'দিন প্রায় না খেয়ে আছে। ঘড়িটা বুড়ির মৃত স্বামীর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক মহান সৈনিক ছিল সে।

এটা তার শেষ চিহ্ন। ও যদি জিনিসটা নিয়ে কিছু 'য়্লটি' দেয়, তাহলে দুধ কিনে শিশুটিকে বাঁচাতে পারে বৃদ্ধা। ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল শিশু, আরও জোরে জোরে আঙুল চুষতে শুরু করল। ঘড়ি নিল না রাহাত। 'য়্লটি' নেই, আছে জার্মান 'মার্ক'। চারদিকে চোখ বুলিয়ে তার কিছু বুড়ির হাতে রেখে দিয়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। অন্যরা দেখে ফেললে ঝামেলা হয়ে যাবে।

দেখল না বুড়ির কান্নার বেগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। আজব মানুষটার জন্যে বিড়বিড় করে অনর্গল শুভ কামনা করছে সে।

বেখেয়ালে স্যাক্সন গার্ডেন এলাকায় এসে পড়ল রাহাত। তার ওপাশে প্রশস্ত সিটি স্কয়ার, পিলুদ্‌জকি। ওখানে সুসজ্জিত জার্মান এসএস প্যাট্রল ডিউটি করছে। চকচকে বুট, পুরু গ্রেটকোট পরা, কাঁধে রাইফেল। দূর থেকে পুতুল মনে হচ্ছে। স্কয়ারের ওপারে রয়েছে প্রকাণ্ড মেইন পোস্ট অফিস বিল্ডিঙ, তার পাশেই গোস্টাপো

হেডকোয়ার্টার্স।

চেষ্টা করেও ওটার কাছে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারল না ও। স্কয়ারে যথেষ্ট মানুষ আছে, কাজেই নির্ভয়ে এগোল। দূর থেকে ওটার দোতলার মোটা গরাদওয়ালা জানালাগুলো দেখল। প্রচুর মাথা ওখানে, বন্দী। হাঁ করে স্কয়ারের মুক্ত পরিবেশ আর মানুষ দেখছে লোকগুলো। বিল্ডিঙটা প্রকাণ্ড। চমৎকার, আধুনিক ডিজাইনের। দেড় বছর আগে ওয়ারশর সবচেয়ে অভিজাত হোটেল ছিল। চেহারা আমূল বদলে ফেলেছে ওটার জার্মানরা।

কোনাকুনি স্কয়ার পেরিয়ে এল রাহাত, বিল্ডিঙটার সামনের বড় রাস্তায় উঠে ডানদিকে এগোল ঘুরপথে কনউইতোরস্কা স্ট্রীটে ওঠার জন্যে। বড়জোর বিশ কদম এগিয়েছে, এমন সময় পিছন থেকে হুশ্ করে সামনে ছুটে গেল একটা কালো মার্সিডিজ। বনেটে লালের ওপর সাদা বৃত্ত বসানো খুদে একটা পতাকা উড়ছে ওটার। কালো রঙের সোয়াস্তিকা রয়েছে বৃত্তের ওপর।

গেস্টাপো!

পিছনে বসা অফিসারটা কে হতে পারে ভাবছিল ও, এই সময় ঘটল ব্যাপারটা। সামনের এক গলি থেকে বেশ দ্রুত ব্যাক করে বেরিয়ে এল এক ট্রাক, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে চট্ করে ডানে হুইল ঘুরিয়ে দিল নিরুপায় মার্সিডিজ চালক। তবু এড়ানো গেল না, স্কিড্ করে পাশ দিয়ে ট্রাকের টেইলবোর্ডের ওপর পড়ল কার। সামান্য তুবড়ে গেল সামনের দরজা। আঘাত আস্তে লাগলেও ব্রেক কষা আর স্কিডের পরমুহূর্তে ধুম! আওয়াজটা একেবারে কম ছিল না।

অন্য কিছু ভেবে সত্রাসে ঘুরে তাকাল পথচারীরা। রাহাত থেমে পড়ল চট্ করে, ওর বড়জোর বিশ গজ সামনে ঘটেছে ব্যাপারটা। কার চালক ট্রাক ড্রাইভারকে তার দেশী ভাষায় খিস্তি করতে করতে বেরিয়ে এল। বডির ডেন্ট দেখে আরও বিগড়ে গেল মেজাজ, তাকে ছেড়ে তার বাপ-মার গুষ্টি উদ্ধার করল কয়েকটা

মোক্ষম, জঘন্য বচনে। ট্রাক ড্রাইভারের তখন নট্ নড়ন-চড়ন অবস্থা, ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে ক্যাবে। তাই দেখে বেশ সন্তুষ্ট হলো ড্রাইভার, হাত ইশারায় ট্রাক নিয়ে দূর হয়ে যেতে বলল তাকে।

একবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল লোকটা, বেধে যাচ্ছে। বরফে বেকায়দাভাবে ফেঁসে যাওয়া কার ঠেলে সরাতে হবে আগে। বিপদ টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রাহাত, হলো না। সবচেয়ে কাছে ছিল ও, ওকেই ডেকে বসল চালক।

'অ্যাই! যাচ্ছ কোথায়, এদিকে এসো। সাহায্য করো আমাকে।'

কিছু করার নেই। বাধ্য হয়ে এগোতে হলো। কাছে গিয়ে এক হাতে পিছনের উইন্ডশিল্ডের সাইড ফ্রেম, অন্যহাতে দুই দরজার মাঝের ফ্রেম ধরে পিছনদিকে ঠেলতে শুরু করল। ড্রাইভার ঠেলছে ওপাশ থেকে। রাহাতের নাকের ঠিক সামনেই বসে আছে কারের আরোহী, স্মার্ট চেহারার এক স্টার্মব্যানফিউরার (মেজর)। চোখে চকচকে, সরু স্টীল ফ্রেমের স্মোকড্ সানগ্লাস। শেষ বিকেলের অন্তিম সূর্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে তার হাই পীকড্ ক্যাপের মনোগ্রাম।

কাঁচ নামানো জানালায় এক হাত রেখে বসে আছে মেজর, অন্য হাতে সিগারেট। নির্বিকার। এতক্ষণে একটা কথাও বলেনি। বেশ লোক জমে গেছে। কাজ সেরে হাঁপ ছাড়ল রাহাত, সুট্‌কে পড়ার চেষ্টা করল। এবার মেজর ডেকে উঠল।

'দাঁড়াও, যেয়ো না।' পকেট থেকে এক মুঠো মার্ক বের করে গুঁজে দিল সে ওর হাতে। 'এই নাও তোমার পুরস্কার,' বলে জনতার দিকে ফিরল। গলা চড়িয়ে বলল, 'দেখলে, রাইখের সাহায্যকারীকে আমরা কত মর্যাদা দিয়ে থাকি? হাইল হিটলার!' আবার রাহাতের দিকে ফিরল। 'ধন্যবাদ, মাই ফ্রেন্ড।'

ওর মুখে বিস্ময় আর বিনীত হাসি দেখে ভীষণ তৃপ্তি পেল সে, মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভারকে হুকুম করল, 'গেহে, শেনেল (গো, কুইক)!'

*

তাজ্জব হয়ে রাহাতের দিকে তাকিয়ে আছে লবকোউইস্কি। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। ওদিকে ড্রিউনস্কি ও তার দুই সঙ্গীর অবস্থাও প্রায় একইরকম।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন,' হুঁশ ফিরতে যুবক বলল। 'লোকটা কে জানেন? গেস্টাপোর পোলিশ চীফ, নিউম্যান।'

শ্রাগ করল রাহাত। 'হবে হয়তো।'

ঘরের মালিক নড়ে বসল। একটু আগে কাজ সেরে ফিরেছে সে দু'জনকে নিয়ে। তারাও প্রতিরোধ যোদ্ধা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে রাহাতকে দেখছে সবাই।

'আপনি তাহলে ভেতরে ঢোকার ব্যাপারে...' প্রশ্ন শেষ করল না ড্রিউনস্কি। তাকিয়ে আছে।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও।

'তাহলে,' সঙ্গীদের দেখাল সে। 'এদের আসা-যাওয়া আছে ওসওয়েসিমে, আত্মীয় থাকে ওখানে। এরা ক্যাম্প সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে আপনাকে। পরামর্শ দিতে পারবে। আর ওখানে ঢুকতে হলে সবচে' জরুরী যা প্রয়োজন...।'

ওদের সাথে ঘণ্টা দুয়েক কাটাল মেজর। আয়নায় নিজের ন্যাড়া মাথা দেখে আফসোস হলো। কিন্তু কিছু করার নেই। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে উঠে পড়ল। সাতটায় ছাড়বে ক্র্যাকাওগামী ট্রেন। ওকে গন্তব্যের কাছে নিয়ে যাবে ওটা। ক্র্যাকাও থেকে ভিয়েনার মেইন-লাইন ট্রেনে উঠতে হবে, ওসওয়েসিম হয়ে যাবে সে গাড়ি।

ম্যাপের সাহায্যে সব চিনিয়ে দিয়েছে ওকে ড্রিউনস্কির সঙ্গীরা।

তৈরি হয়ে নিল মেজর রাহাত। নিউম্যানের দেয়া টাকাগুলো লবকোউইস্কির হাতে দিয়ে সেই বুড়ির নিখুঁত বর্ণনা জানাল। 'পেলে তাকে দিয়ে দেবেন টাকাটা।'

'আচ্ছা।' গুনে দেখল সে—সাতচল্লিশ মার্ক। 'কম করেও এক

মাস চলে যাবে ওদের।' মুখ তুলল। আনা সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল কি চিন্তা করে।

'বলতে হবে না,' তার মনের কথা টের পেয়ে বলল রাহাত। 'আমি আমার যথাসাধ্য করব।'

পাঁচ

ভিয়েনাগামী মেইন-লাইন ট্রেনের গতি কমতে শুরু করেছে। ক্র্যাকাওর উত্তর-পশ্চিমের বিশ মাইল দূরের প্রথম স্টপেজ ওসওয়েসিম এসে পড়েছে।

গতি কমছে টের পেয়ে উঠে পড়ল রাহাত খান। দৃঢ় পায়ে একটার পর একটা কম্পার্টমেন্ট অতিক্রম করে পিছনদিকে চলল। ভাব করল যেন জরুরী কোন কাজ রয়েছে ওদিকে। একে প্রায় ভোররাত, তারওপর ওয়ারশর চেয়ে বহুগুণ বেশি ঠাণ্ডা, যাত্রীদের কেউ চোখ তুলে তাকাবার কষ্টও করল না।

যথেষ্ট লম্বা ট্রেন। সেই তুলনায় স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছোট। যখন থেমে দাঁড়াল, লেজ বেরিয়ে থাকল বেশ খানিকটা। এখানে সংক্ষিপ্ত বিরতি। গার্ড কম্পার্টমেন্টের আগেরটার বাথরুমে ঢুকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর নিঃশব্দে উল্টো দিকে নেমে পড়ল। এদিকটা বেশ অন্ধকার। ঝুঁকে এগোল রাহাত। কাছের পরিত্যক্ত স্টেশন ভবনের আড়ালে চলে এল দ্রুত। ক্যাম্প পুরোদমে চালু হওয়ার পর ওয়েটিঙ রুম ছোট বলে এটা ছেড়ে দিয়েছে জার্মানরা। তাছাড়া আধুনিক কোন সুবিধেও ছিল না

মান্ধাতা আমলের পুরানো ভবনে।

দূর থেকে আলো ঝলমলে নতুন স্টেশনের দিকে তাকিয়ে থাকল রাহাত। বেশ কিছু এসএস অফিসার–জোয়ান নামল ট্রেন থেকে। নিজেদের পরিবহনে চড়ে চলে গেল ক্যাম্পের দিকে। ওটা কাছেই, স্টেশন থেকে বড়জোর এক মাইল দূরে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল ট্রেন, স্টেশনও খালি হয়ে গেল।

ততক্ষণে শীতে জমে যাওয়ার অবস্থা। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কম করেও ত্রিশ ডিগ্রী নিচে হবে মনে হলো ওর। ড্রিউনস্কির দুই সঙ্গী বলেছে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এই মাত্রাই এদিকে স্বাভাবিক।

ঠিক তিনটের সময় দপ্ করে নিভে গেল স্টেশনের সব আলো–বৈদ্যুতিক লাইন কেটে দিয়েছে ক্র্যাকাওর প্রতিরোধ বাহিনীর গেরিলারা। এ আঁধার সাময়িক, রাহাত জানে, এরা ফোন করলেই তৎপর হয়ে উঠবে ওখানকার এসএস ইউনিট। ঠিক করে ফেলবে লাইন। তবে ততক্ষণে রাহাতের আঁধারের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে।

দ্রুত পা চালাল ও। দূর দিয়ে স্টেশন ঘুরে এগোল। বিস্মিত কিছু জার্মান গলা শোনা যাচ্ছে ওখানে, এক-আধটা টর্চলাইটও জ্বলছে। অনেকটা দূর ঘুরে ফের লাইনে ফিরে এল ও, ক্যাম্পমুখী ব্রাঞ্চ লাইন খুঁজে বের করে সেটা ধরে এগোল। নতুন লাইন এটা, বন্দীদের সরাসরি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কয়েক মাস আগে বসানো হয়েছে। অবশ্য ট্রাকেও আসে বন্দী।

ঘন তুষারের মধ্যে দিয়ে ক্যাম্প চোখে পড়ল এক সময়। বিদ্যুৎবাহী উঁচু কাঁটাতারের আউটার ফেন্সের চারদিকে বেশ অনেকগুলো সার্চলাইট জ্বলছে। নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা আছে ক্যাম্পের। জেনারেটরের ভারী গুম গুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তার মানে এখানকার বিদ্যুৎও ক্র্যাকাও থেকে সরবরাহ হয়। মেইন লাইন অফ বলে জেনারেটর চালু করা হয়েছে।

থেমে পড়ল রাহাত খান। শুয়ে পড়ে সামনে নজর দিল। ওরা

ঠিকই বলেছিল, এই অসময়েও বেশ ব্যস্ত দেখা গেল মেইন-গেট। বেশ কয়েকটা সাপ্লাই ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে ঢোকার জন্যে, কিছু বের হচ্ছে। ওরা আসে বন্দীদের জন্যে খাবার নিয়ে, শুনেছে সে। বের হয় তাদের ব্যক্তিগত যা কিছু জমা হয়, সেসব নিয়ে। ওসব বন্দীদের আর প্রয়োজন হয় না। কেন, সেটা অবশ্য জানা যায়নি। ওরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। কেমন একটা গন্ধ আসছে না? বাতাসে নাক টানল ও—কিসের গন্ধ?

চারটা বেজে গেছে দেখে ভেতরে ভেতরে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর দু'ঘণ্টা পর গার্ডদের শিফট বদল হবে, তার আগেই যে ভাবে হোক ঢুকতে হবে ভেতরে। চারদিকের কয়েকটা বড় সার্চলাইট অলসভঙ্গিতে ডানে-বাঁয়ে ঘুরছে নিয়মিত বিরতি দিয়ে। কিছু খুঁজছে বলে মনে হয় না, নিয়ম, তাই ঘুরছে। আসলে খোঁজার মত নেইও কিছু। জার্মান বন্দী শিবিরে অনুপ্রবেশের কথা কোন পাগলও ভাববে না, শক্তি আর ক্ষমতার দম্ভে বুঁদ এসএস তা বোঝে। তাই আলোর বীম অনুসরণ করছে না গার্ডদের চোখ।

শক্ত হয়ে জমে থাকা বরফের মেঝেতে পা ঠুকছে ওরা রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্যে। উঁচু গলায় ড্রাইভারদের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করছে। অপেক্ষমাণ ট্রাকের এঞ্জিন চালু আছে। বন্ধ করার উপায় নেই, দু'মিনিটে রেডিয়েটরের পানি জমে বরফের চাক হয়ে যাবে তাহলে।

উঠে পড়ল ও, আড়ালে আড়ালে ট্রাক বহরের দিকে এগোল। আলোর বীম আসতে দেখলে চট্ করে শুয়ে পড়ে, আবার এগোয়। গুঁড়ি মেরে লাইনের শেষ ট্রাকের খুব কাছে চলে এল রাহাত। টেইলবোর্ডের বাইরে ঝুলছে ওটার ক্যারিয়ার ঢেকে রাখা ড্রপ শীট—বাঁধা হয়নি, অথবা খুলে গেছে বাঁধন। খেয়াল করেছে রাহাত, ভেতরমুখী একটাও এ পর্যন্ত চেক্ করে দেখেনি গার্ডরা। ভাগ্য যদি নিতান্ত বৈরি না হয়, ভরসা করা যায় এগুলোও করবে না।

পায়ের আওয়াজ আড়াল করার কোন প্রয়োজন নেই, যথেষ্ট আওয়াজ করছে হালিখানেক ট্রাক। কড়া নজর রেখে এগোল রাহাত, ওটার কাছে পৌঁছে এক ঝট্‌কায় ক্যারিয়ারে উঠে মাথার ওপর ড্রপ শীট টেনে দিল। মাংসের গন্ধ ভক্ করে ধাক্কা মারল ওর নাকে। সুবিধের লাগল না। আর যাই হোক, তাজা মাংসের গন্ধ ওটা নয়। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল মেজর।

হঠাৎ করে এগোতে শুরু করল ট্রাক, একই সঙ্গে ওর কলজেও ছোটখাট এক লাফ দিল। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝল ঢুকে পড়েছে ভেতরে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সাবধানে শীট তুলে উঁকি দিল। ঘুমে বিভোর ক্যাম্পের পথ ধরে এগোল ট্রাক, একটা বাঁক ঘুরে মেইনগেটের আড়ালে চলে আসতেই তৎপর হয়ে উঠল ও। ঝট্ করে বেরিয়ে এসে ঝুলতে লাগল টেইল বোর্ড ধরে। একটুপর আরেকটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিল, সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ছেড়ে সাঁৎ করে সরে গেল ও, লম্বা এক ব্যারাক বিল্ডিঙের পিছন দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

কোনদিক যাবে ভাবছে। ক্যাম্পের কোন অংশে আছে বোঝার চেষ্টা করছে। যা করার এখনই, খুব দ্রুত করতে হবে। এ এমন এক সময়, যখন পরিকল্পনা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা চূড়ান্ত বোকামি। এরকম মুহূর্তে পরিস্থিতি যেমনই হোক, নিজেকে যেন-তেনভাবে তার সাথে একাত্ম করে নিতে হয়, তারপর নিজের প্রয়োজনমত ভেঙেচুরে গড়ে নিতে হয় পরিবেশ। যে পারল সে জিতে গেল, যে পারল না…। গন্ধটা অসহ্য লাগছে। কেমন একটা…!

টহল গার্ডের পায়ের আওয়াজ কানে আসতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রাহাত। দেয়াল ঘেঁষে অন্ধকার এক কোনার দিকে সরে গেল। ওর দশ হাত সামনে দিয়ে গল্প করতে করতে চলে গেল দুই এসএস গার্ড, অথচ আশ্চর্য, একবারও ডানে-বাঁয়ে তাকাল না। ধরন অন্য হলেও সেই একই মানসিকতা এদের মধ্যেও কাজ করছে বোঝা

গেল। কেবল হেসিয়ান ইউনিফর্ম পরা কোন ইহুদীর বাচ্চা ব্যারাক ছেড়ে এই অসহ্য ঠাণ্ডায় বের হবে না, জানে। জমে মরবে তাহলে।

তাছাড়া বাইরে থেকে ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ আসার তো কোন প্রশ্নই আসে না, কাজেই অহেতুক ঘাড়কে কষ্ট দেয়া কেন? ঘড়ি দেখল রাহাত, পাঁচটা। এক ঘণ্টা আছে শিফট চেঞ্জ হতে। পরনের কাপড়-চোপড়ের চিন্তা আগেই করা আছে, ঘড়িটার কি করা যায়? পায়ে পরলে কেমন হয়, গোড়ালির একটু ওপরে? ইচ্ছে করলে পরা যায়, ব্রেসলেটে বাড়তি স্ট্র্যাপ আছে।

স্টিলেটো বের করে হাঁটু গেড়ে বসল ও, মিনিট দশেক ধরে শক্ত বরফ খুঁড়ে বড়সড় এক গর্ত করল। পরনের সব খুলে সঙ্গে আনা এখানকার ইউনিফর্ম পরে নিল ঝটপট। ওয়ারশর যে কারখানায় বন্দীদের ইউনিফর্ম তৈরি হয়, সেখান থেকে ড্রিউনস্কির আরেক সহযোগীর চুরি করা ড্রেস এটা। একই জিনিস, সন্দেহের কিছু নেই। তারপরও সমস্যা একটা আছে। তা হলো ক্রমিক নাম্বার। প্রত্যেকটা ড্রেসের আস্তিনে ও বুকে ক্রমিক নাম্বার থাকে।

১৫ তারিখের বন্দীদের জন্যে যে ড্রেস বরাদ্দ করা হয়েছে, এটা সেই ব্যাচের। রেইডের সময় আহত এক ইহুদী এখানে রওনা হওয়ার আগে মারা যাওয়ায় বেঁচে যায় এটা। মাথা গুনে বন্দীদের সাথে ড্রেস পাঠানো হয়। বেঁচে যাওয়ায় সেন্ট্রাল স্টোরে ফেরত যাওয়ার কথা ছিল এটার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যায়নি অন্য হাতে পড়েছিল বলে। রাহাতের নাম্বার ১৮৭০১৬৪। এটাই এ ক্যাম্পের বন্দীদের আসল পরিচয়, নাম নয়।

এ ব্যাপারে জার্মানরা বেশ দক্ষ। সিরিয়াল কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হয় এখানে, রোজ দু'বার রোল কল করা হয়। সমস্যা হলো, ভোরের প্রথম কলেই ধরা পড়ে যেতে পারে রাহাত। তবে সে জন্যে অজুহাতও একটা ঠিক করা আছে, প্রয়োজন বুঝলে জার্মানরা ব্যাপার টের পাওয়ার আগে সে-ই ধরিয়ে দেবে ওদের

'ভুলটা'। আশা আছে কাজ হবে। ক্যাম্পে পৌঁছার তারিখ বলতে যদি ভুল না হয়, কেউ সন্দেহ করবে না। ভুল হওয়ার চান্স অবশ্য নেই, ১৫ তারিখের ব্যাচ কবে এখানে পৌঁছেছে, আনার রেকর্ড অফিসের বান্ধবীর কাছ থেকে জেনে নিতে ভোলেনি লবকোউইস্কি। পরনের সব গর্তে ভরে চেপেচুপে বরফ বসিয়ে দিল মেজর। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই শীতে জমে যাওয়ার অবস্থা। ন্যাড়া মাথায় ঠাণ্ডা বেশি লাগছে। এ ছাড়া উপায় ছিল না। ক্যাম্পে এনে বন্দীদের পয়লা চোটে ন্যাড়া করে এরা। তাই ওকেও হতে হয়েছে।

তাড়াতাড়ি ব্যারাকের সামনের শেডের নিচে এসে দাঁড়াল রাহাত। অসহ্য ঠাণ্ডা। কাছের বন্ধ দরজায় হাত দিয়ে চাপ দিল আস্তে করে। নাহ্, খুলছে না। কি করা যায় ভাবছে, এমন সময় মৃদু শব্দে খুলে গেল ব্যারাকের আরেক মাথার দরজা। দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়াল ও। কেউ বের হলো না। একটা মাথা উঁকি দিল শুধু, তারপর গায়েব হয়ে গেল। পরক্ষণে ময়দার বস্তার মত ভারী একটা কিছু উড়ে এল ভেতর থেকে, আছড়ে পড়ল থপাস্ করে। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। শুনশান নীরবতা। সেই গন্ধটা এখন জোরাল লাগছে। পোড়া পোড়া একটা গন্ধ। কিসের? ভাবল রাহাত অন্যমনস্ক মনে।

দ্রুত এগোল পা টিপে। কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা দেহ! মানুষের দেহ–নিথর পড়ে আছে উপুড় হয়ে। ঝুঁকে দেখল ও, বুঝল প্রাণ নেই মানুষটার, বেরিয়ে গেছে। গলার কাছে কালচে হয়ে উঠছে বরফ, তার মানে জবাই করা হয়েছে। চট্ করে আরেকবার বন্ধ দরজাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ও, মাথা দোলাল আপনমনে। নিশ্চই কোন পুরানো শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছে প্রতিপক্ষ রাতের আঁধারে।

সরে পড়বে কি না ভাবছিল, তখনই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি এল মাথায়। মনে মনে আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে

ঝট্‌পট্‌ কাজে লেগে পড়ল ও, তিন মিনিটের মধ্যে মৃতের শার্টের সাথে নিজেরটা বদলে নিল। ওটার কলারে লেগে থাকা রক্ত বরফে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে ভুল হয়নি। জুতোও বদলে নিল। নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবল রাহাত, এবার আর ওর খাঁটিত্ব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। অবশ্য খুনী ছাড়া। মৃতের ক্রমিক নাম্বার নিশ্চই ভোলেনি লোকটা।

কে সে? ভাবল মেজর, ওকে শত্রুর শার্ট পরা দেখলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তার? দেখা যাক্‌, দরকার দেখলে ওকেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। নাক কুঁচকে উঠল ওর। গন্ধটা ভোগাতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে মাংস ঝল্‌সানো গন্ধ। ক্যাম্পে পৌঁছার অনেক আগে থেকেই পাচ্ছে ও বদ গন্ধটা। এখন থেকে থেকে ঘুলিয়ে উঠছে গা।

আসল সমস্যা চিন্তা দখল করে নিল। ক্যাম্প গার্ডদের কেউ চিনে ফেলবে না তো ওকে? ওদের পক্ষে কি সম্ভব এত চেহারা মনে করে রাখার? না নিশ্চই। বন্দীর সংখ্যা প্রায় দুই লাখে পৌঁছেছে, এত মানুষকে কি করে চিনে রাখা সম্ভব? কাঁপতে কাঁপতে শেডের অন্য মাথার দিকে চলল ও। অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এমন সময় নিস্তব্ধ ক্যাম্প কাঁপিয়ে চড়া পর্দায় সাইরেন বেজে উঠল।

দেখতে দেখতে আলো জ্বলে উঠল প্রত্যেকটা ব্যারাকের ভেতরে, সশব্দে একটার পর এক দরজা খুলে যেতে শুরু করল। ঘুম চোখে পঙ্গপালের মত হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে বন্দীরা। ক্যাম্পের মাঝখানের কোথাও থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে কমান্ড ভেসে আসছে। তার সাথে দুর্বোধ্য চিৎকার, খিস্তি। দু'মিনিটের মধ্যে মানুষের বিশাল হাট বসে গেল হতভম্ব রাহাতের চারদিকে।

বাইরে এসে পড়া আলোয় চিক্‌চিক্‌ করে উঠল মাঝখানের বিশাল বরফমোড়া আঙিনা। ভেতর থেকে প্রথমে যারা বের হলো, তাদের দু'একজন ছাড়া ওকে কেউ খেয়ালই করেনি। ঢুকে পড়ল

রাহাত তাদের মধ্যে, মিশে গেল। ধীরগতিতে দৌড়ে ব্যারাকের সামান্য দূরের বিরাট এক প্যারেড গ্রাউন্ডে চলে এল সবাই। নরম, ঝুরঝুরে তুষারে গোড়ালি ডুবে যাওয়ার অবস্থা। এপ্রিল-মে মাসে এই বরফই ধূসর রঙের থক্‌থকে কাদায় পরিণত হবে। সর্দারগোছের কয়েকজনের ধমকধামক খেয়ে সবাইকে লাইন দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে রাহাতও দাঁড়িয়ে গেল। পরে জেনেছে ওরা আসলেই সর্দার, কাপো।

জায়গায় লেফ্‌ট-রাইট করছে সবাই গা গরম রাখার জন্যে, ঘন ঘন হাত কচলাচ্ছে। পোড়া মাংসের গন্ধ ছাপিয়ে আরেক বোটকা দুর্গন্ধ হানা দিল ওর নাকে—দিনের পর দিন গোসল না করা হাজার হাজার মানুষের গায়ের গন্ধ। পাশের এক লোক পড়ে যাচ্ছিল ক্লান্তিতে, তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল রাহাত। ঠিকমত দাঁড় করিয়ে দিল। কৃতজ্ঞতা জানানো দূরে থাক, তাকালও না মানুষটা ওর দিকে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন বর্তমানে থেকেও নেই সে। বহুদূরের কোন জগতে আছে।

দিনের আলোর দেখা নেই তখনও। পেরিমিটার ফেন্সের গা ঘেঁষে আশি মিটার পর পর বসানো কয়েকটা সার্চলাইট স্থির হয়ে আছে আঙিনার ওপর, আশেপাশের সবার প্রতিটা রোমকূপ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় সে আলোয়। ড্রিউনস্কির সহযোগী দু'জন অশউইৎজ সম্পর্কে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর কাহিনী শুনিয়েছে, তা কয়েক ঘণ্টা আগে বাড়াবাড়ি মনে হলেও এখন অন্যরকম লাগছে রাহাতের। মনে হচ্ছে মিথ্যে বলেনি ওরা।

সর্দারগোছের কয়েকজন ছাড়া সবাই যেন এক একটা চামড়া-মোড়া জীবন্ত কঙ্কাল। চোখ কোটরে, চোয়ালের হাড় ঠেলে উঁচু হয়ে আছে বিশ্রীভাবে। কণ্ঠার, কব্‌জির হাড়, আঙুলের গাঁট, সব যেন চামড়া ভেদ করে ফুটে বেরিয়ে আসবে। প্রত্যেকের চোখে সুদূরের হাতছানি, চেহারায় হতাশা আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না ধরনের অলস, গা ছাড়া ভাব। সর্দার যারা, তারাও বন্দী। তবে

তাদের শরীর-স্বাস্থ্য দেখে মনে হয় জার্মানদের কৃপায় খেয়ে পরে ভালই আছে। লাইনে নেই তারা, ঘুরে ঘুরে খবরদারি করছে।

নিজের হ্যাঙলা-পাতলা দেহের জন্যে আরেকবার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাল ও। হেঁটে চলে বেড়ানো কঙ্কাল না হলেও কারও সন্দেহ জাগানোর মত মেদ নেই দেহে, এ জন্যে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে হলো রাহাতের।

'আখ্‌তুঙ (অ্যাটেনশন)!' একযোগে হাঁক ছাঁড়ল কয়েক জার্মান এনসিও। থেমে গেল নড়াচড়া, সোজা হয়ে দাঁড়াল সবাই। অন্তত চেষ্টা করল। সামনে তাকাল রাহাত। এনসিওদের দেখল। ওদের ইউনিফর্ম কোটের কলারে কঙ্কালের খুলি আঁকা ব্যাজ দেখে বুঝল থার্ড প্যানজার ডিভিশনের শুৎজস্টাফেল বা এসএস ওরা। টোকেনকফ (স্টর্মট্রুপার)।

পার্সোন্যাল স্টাফ অফিসারসহ এক মেজর ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল এনসিওদের সামনে। বোধহয় ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট অথবা তার ডেপুটি হবে লোকটা। টিপিক্যাল জার্মান। মাথায় আধ কর সমান সোনালী, ঘন চুলের ওপর বসে আছে উঁচু চুড়োর ক্যাপ। খাড়া নাক, গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত আকাশের মত নীল চোখ। পাতলা ঠোঁট। মেজরের ইঙ্গিত বুঝে তার স্টাফ অফিসার, এক হপ্টস্টার্মফিউরার (ক্যাপ্টেন) ছোটখাট বজ্রপাতের মত চড়াৎ শব্দে কিছু অর্ডার করল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল সর্দাররা। সারিবদ্ধ বন্দীদের মাথা গুনতে শুরু করল। সিরিয়াল নাম্বার যতই নির্ভেজাল হোক, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল রাহাত।

যখন 'শুনল মাথা ঠিক আছে,' ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল। ব্যারাকের সামনে পড়ে থাকা লাশটা কারও চোখে পড়েনি নাকি? ভাবল ও। এরমধ্যেই ভুলে বসে আছে? নাকি এক-দু'জন কম বেশি হলে কিছু আসে-যায় না?

হাঁকডাক শুনে ধ্যান ভাঙল রাহাতের। সবুজ ইনসিগনিয়া পরা দুই সর্দার বন্দীদের ভেতর থেকে শ'খানেক লোককে আলাদা

জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাল। অন্য সর্দাররা বাকিদের হটিয়ে নিল পিছনে। মেজর আর ক্যাপ্টেন নিচু গলায় কি যেন আলোচনা করছে দেখল রাহাত। ক্যাপ্টেনের হাতে বড় একটা খাতা। ওটা খুলে কিছু গুনতে লাগল সে ধৈর্যের সাথে। অনেকক্ষণ পর মাথা তুলল লোকটা, দুই সর্দারের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে মেজরের দিকে ফিরল।

লোকগুলোকে নিয়ে উত্তরদিকে হাঁটা ধরল তারা। দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে তখন। ওরা যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে বেশ উঁচু দুটো চিমনি দেখতে পেল রাহাত। মূল ক্যাম্পের যথেষ্ট দূরে। তার কাছে নিচু ছাদের বেশ বড় দুটো বিল্ডিঙ। কি ওগুলো? বিচ্ছিরি এক সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করল মনে। ওদিকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লোকগুলোকে? সন্দেহটা অবিশ্বাস্য, তবু মন থেকে দূর করতে পারল না ও।

ডানে-বাঁয়ে তাকাল। বিশাল জায়গা নিয়ে ক্যাম্প। পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ একেকটা বন্দী ব্যারাক বা হাট, দরজা চারটা করে। কাঠের বিল্ডিঙ, ছাদ টার পেপারের। অনেক ঘর, মাঝখানে বেড়া দিয়ে আলাদা করা। এপাশে থাকে পুরুষ বন্দী, ওপাশে মেয়েরা। ওদিকেও মাথা গোনা চলছে দেখা গেল।

পাশের লোকটা বিড়বিড় করে কি সব বলছে শুনে কান খাড়া করল। পোলিশ ভাষায়, জড়ানো কণ্ঠে বলছে লোকটা, 'দয়া করো, ঈশ্বর! ওদের তোমার শক্তি দেখাও। তোমার ক্ষমতা দেখাও। এসব নীরবে কি করে সহ্য করছ তুমি, ঈশ্বর! ওদের ঠেকাও। তোমার সৃষ্টিকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করছে ওরা, ওদের...ওদের...'

গলা ধরে এসেছে লোকটার, শেষদিকের কথা তাই বোঝা গেল না। শূন্য দৃষ্টিতে হাঁটতে থাকা দলটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল সে, তারপর চাপা গলায় হেসে উঠল বোকার মত। 'আমি জানি! এখন আমি জানি!'

ঘুরে তাকাল রাহাত।

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আমি জানি, আর কোন সন্দেহ নেই।'

'কিসের কথা বলছেন?'

আকাশ দেখাল সে আঙুল তুলে। 'এতদিন জানতাম ওখানে ঈশ্বর বলে কেউ আছে। আজ বুঝলাম ওসব মিথ্যে। ডাহা মিথ্যে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল ও। 'লোকগুলোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা?'

তাজ্জব হয়ে গেল লোকটা এমন আহাম্মকের মত প্রশ্ন শুনে। কতক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে, তারপর তর্জনী খাড়া করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওপরে তুলল—ধোঁয়া বোঝাতে চাইছে বোকা যুবককে।

বুঝে ফেলল ও। স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল দূরের চিমনি দুটোর দিকে। গন্ধটা তাহলে...!

এ-ও কি সত্যি হতে পারে?

ছয়

গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্স। ওয়ারশ।

ভেতরটা যথেষ্ট উষ্ণ, ঠাণ্ডা ঢোকার কোন উপায়ই নেই, অথচ তারপরও আন্টারস্টার্মফিউরার (সে. লেফটেন্যান্ট) হেল্ড কাঁপছে। এক ঘণ্টার বেশি হতে চলল তার সুপিরিয়র, মেজর নিউম্যান, অফিস ছেড়েছে। কিন্তু তার লোহার সাঁড়াশির মত হাতের

আঙুলের স্পর্শ এখনও কাঁধে অনুভব করছে সে। হাতের চামড়ার গ্লাভসের কচমচ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। তার কলজে হিম করা মৃদু গলাও।

গলা মিষ্টি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মধু বর্ষণ করে যেন কানে। তবে বিষাক্ত মধু, এই যা।

মেজর কখন তার অফিসে ঢুকেছে, হেল্ড টেরও পায়নি। কাঁধে-ঘাড়ে নতুন গ্লাভসের ঠাণ্ডা, ভারী চাপ খেয়ে তবে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে উঠল সে, হুঁশ হতে উঠে অ্যাটেনশন হওয়ার চেষ্টা করল, পারেনি। ঘাড় ধরে চেপে বসিয়ে রাখল মেজর।

'না না, হেল্ড, উঠো না,' বিষাক্ত মধুর স্বরে বলে উঠল। 'বসে থাকো। যে গুরু দায়িত্ব পালন করছ, করতে থাকো। চমৎকার দেখাচ্ছ তুমি।'

তার বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল, এমন সাঙ্ঘাতিক সম্মোহনী শক্তি, একেবারে অনড় হয়ে গেল যুবক। ঘামতে শুরু করল।

'কতগুলো ফাইল চেক করেছ তুমি, হেল্ড?'

ঢোক গিলল আন্টারস্টার্মফিউরার। 'একশো ছয়টা, হের স্টার্মব্যানফিউরার। আর মাত্র...'

'বাহ্, দারুণ! চমৎকার! কী সাঙ্ঘাতিক কাজ দেখালে!' এতগুলো প্রশংসাসূচক শব্দ, অথচ তার গলার স্বর একেবারেই অন্যরকম লাগল হেল্ডের। 'আর কতগুলো চেক্ করা বাকি থাকল তাহলে?'

'প্রায় তি-তিনশো, হের...'

'গুট্ (গুড)!'

দীর্ঘ নীরবতা। অসহ্য! অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল জুনিয়র, নার্ভ ছিঁড়ে যাওয়ার দশা হলো। এমন সময় ফের কান ভরে উঠল। 'আজ-কত তারিখ?'

'বাইশ তারিখ।'

'এর মানে হচ্ছে, তুমি রোজ মোটামুটি ত্রিশটা হারে ফাইল

দেখছ। অর্থাৎ বাকিগুলো দেখতে দেখতে বছর শেষ হয়ে যাবে, কেমন?'

'আমি···আমি আরও তাড়াতাড়ি করব।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?' হেল্ডের কাঁধে সাঁড়াশির মত চেপে বসল মেজরের থাবা। 'কিন্তু তাতে যে কাজ হবে না, ইয়াংম্যান! কাল আমি ছুটিতে দেশে যাচ্ছি, ফিরব জানুয়ারির এক তারিখ। এসে প্রত্যেকটা ফাইল আমি আমার টেবিলে রেডি চাই, বোঝা গেছে? এদের মধ্যে সন্দেহজনক কেউ আছে কি না, থেকে থাকলে তাদের নামের একটা তালিকাসহ।'

'নিশ্চই, হের স্টার্মব্যানফিউরার, নিশ্চই! সব রেডি থাকবে। আমি নিজ হাতে করে রাখব সবকিছু। ধন্যবাদ, হের···'

'ধন্যবাদ? ধন্যবাদ কেন, লিয়েবচেন (মাই চাইল্ড)? আমি তো বলিনি আমি তোমার কাজে খুশি হয়েছি। বরং উল্টোটাই হয়েছি, বুঝলে? ফিরে এসে সব রেডি চাই আমি, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তুমি তখন থাকবে না।'

'জ্বি!' থতমত খেয়ে গেল যুবক।

'জা (ইয়েস), মাই ডিয়ার আন্টারস্টার্মফিউরার। তুমি তখন থাকছ না।'

অনেক কষ্টে ঢোক গিলল সে. লেফটেন্যান্ট। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেছে, গিঁট লেগে গেছে যেন শ্বাসনালীতে।

'হাতের কাজ শেষ হলে এখানকার স্যুয়ার চেকিঙ ইন-চার্জের কাছে রিপোর্ট করবে তুমি। সে তোমাকে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে ইহুদী ইঁদুর তাড়া করে বেড়াবার নতুন মিশন দেবে। জানি কাজটা নোংরা, তবে কিছুদিন টানেলের সুগন্ধি পানিতে সাঁতার কাটলে আশা করি জরুরি কাজ দ্রুত সারার উপলব্ধি আসবে তোমার মধ্যে।'

বাঁকা হাসি ফুটল মেজরের মুখে। 'ওখানে অবশ্য কাজ তাড়াতাড়ি না করে উপায়ও নেই তোমার। কখন, কোনখান থেকে

নোংরার বৃষ্টি মাথায় এসে পড়বে, কে জানে?'

জমে গেল হেল্ড। স্যুয়ার! আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল? গট্ (গড)! এত জায়গা থাকতে শেষে কি না ওখানে? ফ্যানাটিক ইহুদী গেরিলা যোদ্ধারা থাকে ওর মধ্যে, এক মিনিটের নিশ্চয়তাও নেই ওখানে জীবনের। ওয়ারশতে টানেলে বদলি চূড়ান্ত শাস্তি। ইন-চার্জ হ্যাসেল অবশ্য ওখানে কাজ করতে পছন্দ করে, তবে সে যে উন্মাদ, তাও সবার জানা। উন্মাদ না হলে এক বছর ধরে ও কাজ করে কেউ?

এখন হেল্ডকে তার সাথে কাজ করতে হবে? শহরবাসীর গু-মুতের মধ্যে? গলা ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হলো, নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে এতই গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন যে খেয়ালই নেই কখন কাঁধ থেকে হাতটা সরে গেছে। বাতাসের মৃদু ছোঁয়ায় খোলা ফাইলের থিন পেপার শীট কেঁপে উঠল।

দরজা খোলা রেখে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবল মেজর। মুখে কৌতুকের হাসি। 'তুমি যে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছ, তা কিন্তু শুনিনি আমি, হেল্ড।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসেই থাকল যুবক, পিছনে তাকাতে সাহস হচ্ছে না। যদিও জানে মেজর এখন শান্ত মেজাজে আছে। তার কৌতুক করার অর্থই তাই। এ সময় মেজরের মন ভাল থাকে। অবশ্য হাসিমুখেও অনেক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে বসে মানুষটা। হেল্ড শুনেছে, কয়েকদিন আগে রেইড চালাতে গিয়ে দশ-বারো বছরের এক পোল কিশোরকে ঠেলে সাততলার খোলা ব্যালকনিতে নিয়ে গিয়েছিল মেজর। জানতে চেয়েছিল ছেলেটা প্যারাট্রুপার হতে রাজি আছে কি না। হলে তাকে ছেড়ে দেবে, কিছু বলবে না। রাজি হয় কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে ফেলে দেয় সে নিচে। ছেলেটা যখন পড়ছে, মেজর তখন চেঁচিয়ে উৎসাহ দিয়ে বলেছে, স্যুট ছাড়া জীবনের প্রথম জাম্পের অভিজ্ঞতা কেমন, তাড়াতাড়ি ওপরে এসে তা যেন তাকে জানানো হয়।

এক মিনিট পর ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে. লেফটেন্যান্ট। নেই মেজর, কখন চলে গেছে কে জানে!

মেজর রাহাতসহ শ'খানেক লোক নিয়ে একটা আলাদা গ্রুপ তৈরি করা হলো। সেই মানুষটাও আছে তার মধ্যে। ব্যাপার বুঝতে না পেরে লোকটার দিকে ফিরল ও, ফিসফিস করে এর কারণ জিজ্ঞেস করল।

'ক'দিন থেকে আছ এখানে, ব্রাদার?' সন্দেহের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল সে। 'কিছুই দেখছি জানো না তুমি!' ও তরফের সাড়া না পেয়ে নিজেই আবার মুখ খুলল। 'এর অর্থ স্পেশাল সন্ডারকোমান্ডো গ্রুপ করা হলো আমাদের নিয়ে। আগামী এক মাস স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাদের।'

'ও, আচ্ছা!'

'ভাল খানাপিনা দেবে ওরা, বিনিময়ে করিয়ে নেবে যত জঘন্য কাজ।'

ঝুঁকি নিয়ে আবার প্রশ্ন করে বসল, 'তারপর?'

'কি তারপর?'

'এক মাস পর কি ঘটবে আমাদের ভাগ্যে?'

'যে দলটা গেল, ওরা আগের টার্মের স্বেচ্ছাসেবক,' গলা একদম খাদে নামিয়ে বলল সে। মুখে বিকারগ্রস্তের হাসি। 'ওদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলার সময় তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে, ভায়া।' মাথা দোলাল আপনমনে। 'বুঝতে পারবে।'

কানের পাশে হাঁক ছাড়ল এক দৈত্যাকার সর্দার। ছয় ফুট চার ইঞ্চির এক সুতোও কম হবে না সে দৈর্ঘ্যে, অনুমান করল রাহাত। মুখটা গামলার মত প্রকাণ্ড, ছোট ছোট দু'চোখের নিচে চর্বির বালিশ ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারা। বুনো শুয়োরের মত লাগে দেখতে, কথাও বলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

তার নির্দেশে বরফ মাড়িয়ে এগোল নতুন স্বেচ্ছাসেবীর দল।

কিছুদূর এগিয়ে বুক সমান এক কাঠের গেটের সামনে দাঁড়াতে হলো। দুই পাথরমুখো এসএস সার্চ করল ওদের এক এক করে। শেষ পর্যন্ত ঘড়ি সঙ্গে না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে নিজেকে ধন্যবাদ জানাল রাহাত। বড় বাঁচা বেঁচেছে। নইলে সর্বনাশ ঘটে যেত। কি ঘটত, কয়েক মুহূর্ত পর চোখের সামনে তার নমুনাও দেখল।

লোহা কাটার সরু করাতসহ ধরা পড়ল এক বন্দী। সুতো দিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে রেখেছিল সে ওটা। কোত্থেকে জিনিসটা জোগাড় করেছে, ওটা দিয়ে কি করার ইচ্ছে ছিল, কিছুই জিজ্ঞেস করল না গার্ড, সর্দারকে নির্দেশ দিল তার ইউনিফর্ম খুলে নিতে।

একদম উলঙ্গ করে দু'মিনিটের মধ্যে লোকটাকে বেঁধে ফেলা হলো গার্ড হাটের দেয়ালের সাথে। একটুও বাধা দিল না সে। জানে লাভ নেই, তাই কোনরকম করুণা ভিক্ষেও করল না। নীরবে মেনে নিল নিয়তিকে। কঙ্কালসার দেহে দাঁড়িয়ে থাকল প্রচণ্ড শীতের মধ্যে। প্রতিটা হাড় আলাদা করে চেনা যায়। শিউরে উঠল রাহাত, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। আর সবাই একদম নির্বিকার। এটা যে কোন ব্যাপার, তা তাদের চেহারা দেখে মনেই হয় না।

'কতক্ষণ চলবে শাস্তি?' প্রশ্ন করল ও।

'রাত পর্যন্ত।'

চেষ্টা করেও চেহারার বিস্ময় গোপন করতে পারল না মেজর। 'এই সামান্য অপরাধে!'

'তোমার সামান্য মনে হতে পারে, থার্ড রাইখের নয়।' আবার সন্দেহ ফুটল লোকটার চোখের তারায়। 'খুব বেশি কৌতূহল তোমার!'

সবুজ টার পেপারমোড়া ঢালু ছাদের ছোট ছোট অসংখ্য হাটের মধ্যে দিয়ে এগোল ওরা সর্দারের তাড়া খেয়ে। খানিকটা গিয়ে থামতে হলো, বাঁ দিকের এক গার্ড হাটে গিয়ে ঢুকেছে ব্যাটা।

পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল রাহাত সঙ্গীর প্রশ্ন শুনে।

'তুমি কে বলো তো?'

'কি?' চোখ কুঁচকে উঠল ওর।

'তোমার পরিচয় জানতে চাইছি,' শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'কারণ ওই নাম্বারটা তোমার নয়, আর কারও।'

ঘাড় মটকে লোকটাকে জায়গায় শেষ করে দেয়ার জরুরি তাগিদ অনেক কষ্টে দমন করল ও। একে সুযোগ নেই, তাছাড়া মনে হচ্ছে তার কোন দরকারও নেই। ফাঁকটা ধরতে পেরেও চুপ করে আছে সে, কাজেই এখনই ভয়ের কিছু নেই। তবে এই খবরটা ফাঁস করে হয়তো কিছু সুবিধে আদায় করতে পারত সে জার্মানদের কাছ থেকে, হয়তো বা মুক্তিও পেতে পারত। কেন করল না?

'তার মানে তুমিই লোকটাকে খুন করেছ,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল রাহাত। 'তার সাথে কোন শত্রুতা ছিল তোমার।'

জবাব নেই।

'তাই তুমি এত নিশ্চিত আমি সে নই।' একটু বিরতি দিয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন খুন করলে লোকটাকে?'

জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।'তুমি কে, ব্রাদার? আমি নিশ্চিত তুমি পোলিশ নও, তাহলে?'

'তুমি কে? কেন ধরেছে এরা তোমাকে, ইহুদী বলে? না রেজিসটেন্স মুভমেন্টের সাথে জড়িত ছিলে বলে?'

বিভ্রান্তি ফুটল তার চোখে। 'দুটোই। এরা অবশ্য পরেরটা জানে না। আমার পুরো পরিবার জড়িত মুভমেন্টের সাথে। কিন্তু...তুমি কে?'

দ্রুত চিন্তা করতে লাগল রাহাত। মানুষটা যা-ই হোক, নির্দ্বিধায় নিজের গোপন খবর বলে ফেলেছে ওকে। ও ফাঁস করে দিতে পারে, সে ঝুঁকি থাকার পরও। তার মানে লোকটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে ওকে। অতএব রাহাতও করতে পারে। তাতে বরং

লাভই হবে।

'তুমি ঠিকই ধরেছ,' অবশেষে বলল। 'আমি পোলিশ নই।'

'এবং বন্দীও নও।'

'হ্যাঁ।'

'কে তাহলে তুমি?'

জবাব দিল না ও। বেঁধে রাখা লোকটার দিকে তাকাল। অসহ্য শীতে কুঁকড়ে গেছে। বসে পড়তে চাইছে, কিন্তু হাত কাঁধ বরাবর মজবুত করে বাঁধা বলে পারছে না। না দাঁড়ানো না বসা অবস্থায় ঝুলে আছে। পরিষ্কার শোনা যায় তার দু'পাটি দাঁতের ঠক্‌ঠকানি।

'তুমি কে বললে না?' ফের এল প্রশ্নটা।

'জেনে তোমার কি লাভ?'

আশার আবছা আলো জ্বলে উঠল মানুষটার মলিন চেহারায়। 'বুঝেছি,' দেড় হাতের মধ্যে দাঁড়িয়েও এত আস্তে বলল যে রাহাতও শুনতে পেল না ঠিকমত। 'ব্রিটিশ স্পাই তুমি। নইলে সেধে এখানে ঢুকবে, এমন পাগল দুনিয়াতে থাকতে পারে না।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল ও। ব্যাটার বুদ্ধি আছে। 'তোমার নাম কি?'

'ম্যান। তাদুয়েস ম্যান।' বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওকে দেখল সে। পাল্টা কিছু যখন বলল না, তখন তার ধারণাই সত্যি বলে মনে মনে খুশি। 'কেন ঢুকেছ?'

'আমার এক বন্ধুকে জরুরি একটা খবর জানাতে।'

চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'মানে! কি এমন খবর?'

'ওর মার মৃত্যুর খবর,' গম্ভীর গলায় বলল রাহাত।

চোখ কোঁচকাল পোল, পরক্ষণে হেসে উঠল। 'বিশ্বাস করলাম না। ক্যাম্পে কোন খবর পৌঁছাতে বাধা নেই, অন্য বহু উপায়ে খবরটা পাঠানো যেত।' একটু ভাবল। 'তার মানে সত্যি কথাটা বলবে না। না বললে কি, আমি বুঝে গিয়েছি।'

ঘুরে তাকাল ও। প্রশ্ন করল না।

'কাউকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছ তুমি, ঠিক?'

গেট পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল দলটা। সর্দারের পিছন পিছন দূরের দুই চিমনির দিকে চলল। 'এসে গেছে নরক,' প্রসঙ্গ ঘোরাল লোকটা। 'এখন দেখতে পাবে ওদের কি পরিণতি হয়।'

জায়গাটা ক্যাম্পের উত্তরে, পেরিমিটার ফেন্সের ভেতরে। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে অনেক লম্বা দুই স্টীলের চোঙ, মুখ দিয়ে অনর্গল তীব্র কটুগন্ধী ধোঁয়া বের হচ্ছে। অলসভঙ্গিতে পাক্ খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ও দুটোর গোড়ার কাছে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। শিখা দেখা যায়। দুর্গন্ধে দম আটকে এল রাহাতের, ভীষণ ওলট-পালট শুরু হলো পেটের মধ্যে।

প্রথম স্বেচ্ছাসেবীর দলটাকে আরেক দল গার্ডের হাতে তুলে দেয়া হলো। নাকের মাঝখান পর্যন্ত কালো লিনেনের মাস্ক পরে আছে তারা। চোখে খুনীর দৃষ্টি ওদের। কাঁধে শেমিসার সাব-মেশিনগান।

'এইনসাৎজগ্রুপেন!' চাপা গলায় বলল লোকটা।

'কি?'

পরেরবার বুঝল মেজর। সোজা বাংলায় কথাটার অর্থ বিশেষ জল্লাদ বাহিনী। নির্মম, নির্দয় গেস্টাপো বাহিনীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে বেশি প্রিয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হেইনরিখ হিমলারের।

'ওদের ছায়াও কখনও মাড়িয়ো না। বিষাক্ত ফোস্কা পড়বে চামড়ায়।'

এক জায়গায় মাটি কেটে চওড়া ড্রেনমত তৈরি করা হয়েছে। দু'পাড়ে উঁচু হয়ে আছে মাটি, বরফ। তার কিছুটা এপাশে লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হলো লোকগুলোকে। প্রায় শ'খানেক হবে। মাথা গুনে দেখল জল্লাদ বাহিনী। একটু পর বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল ওদের একজন। নীরবে কাপড় ছাড়তে শুরু করল মানুষগুলো। প্রতিবাদ তো দূরের কথা, একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল

না কেউ।

না, একজন করল শেষ পর্যন্ত। কিছু বলল সে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল এক মুখোশধারীর দেহে। শেমিসারের বাঁট দিয়ে তার মুখের ওপর দড়াম করে মেরে বসল লোকটা।

হুঙ্কার ছাড়ল, 'শোইজেন-সিয়ে (শাট আপ্)!'

যার উদ্দেশে বলা, সে জ্ঞান হারিয়েছে ততক্ষণে। হুড়মুড় করে আছড়ে পড়েছে চিৎ হয়ে। পড়েই থাকল অনড়। গুঁড়িয়ে যাওয়া নাকমুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে বরফে। অস্ত্র কাঁধে রেখে এগোল গার্ড, রাগ পড়েনি। ভারী বুটের ডগা দিয়ে লোকটার বেরিয়ে থাকা পাঁজরে ধাঁই করে ঝেড়ে লাথি হাঁকাল। কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

'থাক্ পড়ে,' বলল আরেকজন। 'এক শুয়োরের পরিণতি দেখে অন্য শুয়োরদের হয়তো কিছু আক্কেল হবে।'

গলাটা পিছন থেকে আসছে বুঝতে পেরে ঘুরে তাকাল রাহাত খান। সেই মেজর–ক্যাম্প কমান্ড্যান্ট। এরমধ্যে তার নাম জানা হয়ে গেছে ওর, মেজর গ্রজ। ওদের পাশ দিয়ে অজ্ঞান লোকটার দিকে এগোল সে। ওয়েস্ট হোলস্টার থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার পিপিকে। তার ইঙ্গিতে দুই মুখোশধারী টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করাল অজ্ঞান লোকটাকে। থুতনি ঠেকে আছে তার বুকের সাথে, কাঠির মত হাঁটু ভাঁজ হয়ে আছে। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে টপ্ টপ্ করে।

সামনের সারিতে দাঁড়ানো রাহাতকেই পছন্দ হলো মেজরের। মৃদু হাসি দিল ওর চোখে চোখে তাকিয়ে। 'দেখে রাখো, নোংরা বিষ্ঠার দল! আগামী এক মাস এখানে কাজ করতে হবে তোমাদের। কি কাজ? বিষ্ঠা পরিষ্কার করার কাজ।'

মাটির স্তূপ দেখাল সে। ওপাশের আগুনের তেজ আগের থেকে কিছুটা বেড়েছে। উত্তাপের কাঁপা কাঁপা অদৃশ্য ধোঁয়ায় ওপাশের গাছপালা কাঁপছে। নাচছে।

'প্রথমে,' বলে অজ্ঞান লোকটার মাথার পিছনে ওয়ালথারের নল ঠেকাল মেজর, হাসতে হাসতে ট্রিগার টেনে দিল।

বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ উঠল। ভয়ানক এক ঝাঁকি খেল নুয়ে থাকা মাথাটা। 'এইটা ঘটবে।'

রাহাতের চোখ সেঁটে আছে হতভাগ্য মানুষটার ওপর। তার মুখের সামনের প্রায় পুরোটাই উড়িয়ে নিয়ে গেছে বুলেট, বাঁ চোখটা সুতোর মত এক রগের মাথায় দোল খাচ্ছে। রক্ত আর রক্তাক্ত মগজে মাখামাখি হয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে মৃতের চেহারা। হাত ছেড়ে দিল দুই জল্লাদ, নিজেদের গায়ে যাতে নোংরা না লাগে, সে জন্যে লাফ দিয়ে সরে গেল। কাটা কলাগাছের মত আছড়ে পড়ল লাশটা।

ম্যানের দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ শুনল রাহাত। অন্য সবাই স্থির, একটা পিন পড়লেও হয়তো শোনা যাবে। জড় পদার্থ বনে গেছে প্রত্যেকে। মেজর গ্রজকে ভাল করে দেখল রাহাত, সময়-সুযোগ এলে পাওনা মেটাতে কোন সমস্যা যাতে না হয়, সে জন্যে মনের পর্দায় লোকটার পরিষ্কার ছবি এঁকে নিল।

'এবার,' ওয়ালথার ধীরেসুস্থে হোলস্টারে পুরে বাটন আঁটল সে। দুই মুখোশধারীকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে দুটো লাঠি দেখছ ওদের হাতে, ওগুলো দিয়ে এই বিষ্ঠার থলেটাকে জায়গামত নিয়ে কি করে ফেলতে হবে, এখন দেখাবে ওরা।'

তাই করল লোক দুটো। দু'দিক থেকে লাশের ঘাড় ও হাঁটুর নিচে লাঠি ভরে দেহটা ভাঁজ করে 'দ' বানিয়ে ওপরদিকে তুলে ফেলল, তারপর উঁচু করে জোর এক দোল দিয়ে ছুঁড়ে মারল কয়েক গজ দূরে। কাজের ধরন দেখেই বোঝা গেল এ কাজে দারুণ এক্সপার্ট লোক দুটো।

'ড্যাঙ্কি (থ্যাঙ্ক ইউ)!' তাদের উদ্দেশে বলল গ্রজ। রাহাতের দিকে তাকাল। 'ওখানে আগুনের পিট আছে, এগুলো ওর মধ্যে নিয়ে ফেলতে হবে তোমাদের। সরবরাহে কোন অভাব ঘটবে না,

তোমাদেরও কাজের অভাব হবে না। যে যত বেশি কাজ করবে, তার মুক্তি তত তাড়াতাড়ি হবে। ক্যাম্পের গেটে কি লেখা আছে, ঢোকার সময় দেখেছ তো? আরবেট্ মাইখট্ ফ্রেই, তার মানে কর্মেই মুক্তি।' তর্জনী তুলল মেজর। 'মনে রেখো।'

ঘুরে দাঁড়াল। দুই এসএস এনসিওর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'শুরু করে দাও। দেরি করলে ঠাণ্ডা লেগে মরবে ব্যাটারা।'

শব্দ করে হাসল লোক দুটো, পরক্ষণে খ্যাঁক খ্যাঁক করে একের পর এক নির্দেশ দিতে শুরু করল বন্দীদের।

রাহাত অপ্রস্তুতের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, বুঝে উঠতে পারছে না কি করবে। চোখের সামনে কাতারে কাতারে মানুষ মরবে, আর তাদের লাশ টেনে নিয়ে ওদেরকে পিটে ফেলতে হবে, এ কি আসলেই সত্যি, না দুঃস্বপ্ন, ভেবে পাচ্ছে না। এ কী অবিশ্বাস্য কথা!

যুদ্ধের মাঠে পাইকারী মানুষ মরে, গোলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু তার পিছনে কারণ থাকে, আদর্শ থাকে। আর এখানে নির্বিচারে···।

ভাবনা শেষ হলো না, ওদিকে শুরু হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে অবাক হওয়ার মত মনের অবস্থাও হারিয়ে ফেলল ও।

কয়েক সারিতে দাঁড়ানো প্রাক্তন স্বেচ্ছাসেবীদের প্রথম সারির দশ-বারোজনকে ডাকল দুই এনসিও। শীতে হি হি করতে করতে এগোল তারা। তাকিয়ে থাকল রাহাত। স্তূপের ওপর উঠে আবার লাইন দিয়ে দাঁড়াল উলঙ্গ মানুষগুলো, পিছন ফিরে। পিঠের প্রতিটা পেশীতে খিঁচ ধরে গেছে ওদের অসহ্য ঠাণ্ডায়, দাঁড়াতে পারছে না কেউ সোজা হয়ে।

সিগারেট টানতে টানতে অলস পায়ে সারির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল দুই এসএস, নির্বিকার চেহারায় একটার পর একটা গুলি করে চলল তাদের মাথার পিছন দিক সই করে। হুমড়ি খেয়ে টপাটপ্ আছড়ে পড়তে থাকল মানুষগুলো। চুরমার হয়ে শূন্যে

উড়ে বেড়াতে লাগল তাদের খুলির টুকরো, মগজ-রক্ত, দাঁত-মাড়ি—অকল্পনীয়, অচিন্তনীয় সে দৃশ্য। দেখলে পাষাণেরও বুক কেঁপে উঠবে।

গুলির শব্দ থেমে গেলে জোড়ায় জোড়ায় ছুটে গেল নতুন স্বেচ্ছাসেবীরা, শেখানো কায়দা অনুযায়ী লাঠির সাহায্যে একটা করে দেহ তুলে নিয়ে পিটের দিকে চলল হাঁপাতে হাঁপাতে। গনগনে আগুনের ওপর বসানো আছে এক মাথা নিচু প্রশস্ত এক লোহার পাত, মাঝখানটা ঢালু, হতভাগ্যদের ওর ওপর নিয়ে ফেলতে লাগল। পড়ামাত্র চড়চড় শব্দে ভাজা হতে শুরু করছে দেহগুলো। চল্লিশ ফুটের মত দীর্ঘ পাতের নিচু মাথার কাছে বড় বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন, মৃতদেহ থেকে গলে বেরিয়ে আসা ফুটন্ত চর্বি গড়িয়ে গিয়ে পড়ছে ওর মধ্যে।

মাথা ঘুরে উঠল রাহাতের প্রথম বোঝা টানতে গিয়ে। মানুষটা তখনও মরেনি, একটু একটু নড়ছে। বুলেট ঠিক জায়গায় লাগেনি তার, একপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর জোড়া ছিল তাদুয়েস ম্যান, ওর মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখে চাপা কণ্ঠে সতর্ক করল সে। 'হাঁটো! একটু এদিক-ওদিক দেখলে তোমাকেও জ্যান্ত পিটে ছুঁড়ে মারবে ওরা।'

বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠতে থাকা অদম্য ক্রোধ, বিস্ময়, দুঃখ, অনেক কষ্টে দমন করল রাহাত। ওসব এই নরকে অর্থহীন, প্রকাশ করতে গেলে নিজের প্রাণটা খোয়াতে হবে। তাই গলা টিপে ভেতরের সমস্ত অনুভূতি মেরে ফেলল ও, গিলে খেয়ে ফেলল।

টুকরো হাড়, হাড়ের কণা, দাঁত-মাড়ি, রক্ত আর চটচটে মগজ মাড়িয়ে একটার পর একটা দেহ বয়ে নিয়ে পিটে ফেলতে থাকল। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার মধ্যে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে হয়তো।

কোত্থেকে এসেছে ও, কেন এসেছে, কি কাজে, সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। অবাস্তব মনে হচ্ছে। এ মুহূর্তে অবিরাম গুলি,

আর্তনাদ, পিট আর বালতি ভর্তি চর্বি, এগুলোই বাস্তব ওর কাছে। আর সব মিথ্যে।

অনবরত লুটিয়ে পড়তে থাকা দেহ নিয়ে মেশিনের মত ছুটতে ছুটতে একটাই ভাবনা মাথায় আসছে ওর বারবার—সভ্যতা মিথ্যে, মানবতা মিথ্যে, নীতি-আদর্শ মিথ্যে, ধর্ম মিথ্যে। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। সত্যি কেবল অশউইৎজ নামের এই নরক।

দুই এসএস, তাদের অস্ত্র-বুলেট, মৃত্যু আর মাংস পোড়ার দুর্গন্ধ, এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন সত্যি নেই। থাকতে পারে না।

সাত

অসহ্য দুর্গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস।

পিট থেকে আগুনের যে হল্কা উঠছে, তাও সহ্যের বাইরে। লাশ ফেলতে গেলে পশম পুড়ে যায়; চোখমুখে ছ্যাঁকা লাগে। যতটা সম্ভব দূর থেকে কাজ সারতে হচ্ছে।

কতবারের বার মনে নেই রাহাত খানের; একটা লাশ নিয়ে পিটের দিকে এগোচ্ছে, মাঝপথে ওটা আচমকা 'জ্যান্ত' হয়ে উঠল। আসলে গার্ড মিস করেছিল, বুলেট মাথার পাশের খানিকটা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ায় কিছু সময়ের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল লোকটা। জ্ঞান ফিরতেই যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেতে শুরু করল। তার আধা জবাই হওয়া খাসীর মত ছট্‌ফটানি আর আকাশ ফাটানো চিৎকারে সবাই থমকে গেল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল

রাহাত। সরে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু খপ্ করে বাহু চেপে ধরল ম্যান।

'খবরদার! এক পা নড়লে মরবে!'

এক কোমরে হাত রেখে দূর থেকে লক্ষ করছিল মেজর গ্রজ, ট্রুপারদের একজনকে আহত লোকটার দিকে আবার অস্ত্র তাক করতে দেখে খেঁকিয়ে উঠল কুকুরের মত। 'না! ওর ওপর আর একটা গুলি খরচ করেছ কি রাইখের সম্পদ অপচয় করার অপরাধে তোমার কোর্ট মার্শাল করব আমি।'

থতমত খেয়ে পিছিয়ে গেল ট্রুপার, কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ওদিকে মানুষটার চিৎকার-গোঙানি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

'লাথি মেরে পিটে ফেলো ওটাকে!' বাতাসে চাবুক হানল মেজরের বাজখাঁই, অমার্জিত গলা।

ব্যস্ত হয়ে উঠল ট্রুপার। পিস্তল ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে ভারী বুটের কয়েক লাথিতে পিটের খুব কাছে নিয়ে গেল লোকটাকে। এক পা ঝপ্ করে নেমে গেল তার কিনারা গলে, আগুনের তীব্র আঁচে মুহূর্তের মধ্যে চামড়া কুঁকড়ে যেতে শুরু করল ওটার, বড় বড় ফোস্কা উঠেই পট্ পট্ শব্দে ফেটে যাচ্ছে। মাটি খাবলে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আসার মরিয়া চেষ্টা করল লোকটা, আতঙ্কে অবর্ণনীয় চেহারা হয়েছে। তার ভয়াবহ, অবিরাম চিৎকারে সবার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

অধৈর্য হয়ে উঠল ট্রুপার। লোকটার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করার ফাঁকে এক টানে ম্যানের লাঠিটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে মেরে বসল মাথায়। খুলি লম্বালম্বি বসে গেল ইঞ্চিখানেক, থেমে গেল সমস্ত তড়পানি, শেষবারের মত গুঙিয়ে উঠে কিনারা গলে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। ঝামেলা বিদেয় হতে আবার জোরেশোরে আরম্ভ হলো কাজ। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু পরই ঘটল আরেক অঘটন।

প্রথম দলের লোকসংখ্যা বেশ কমে এসেছে, এমন সময় নতুন সন্ডারকোমান্ডোদের একজন স্থির হয়ে গেল পরের মৃত্যুপথযাত্রীদের মধ্যে তার আপন ছোট ভাইকে দেখতে পেয়ে। ওরা দু'জনেই অল্পবয়সী, বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। এইজন দু'বছরের বড়। দু'জনেই ব্রেসলাউর রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর নেতাগোছের, তাদুয়েস ম্যান রাহাতকে জানাল তথ্যটা। ছোট ভাই ধরা পড়েছে আগে।

'আঁদ্রেই!' বড় ভাই চেঁচিয়ে ডাকল এদিক থেকে। তার গলার কাঁপন স্পষ্ট শুনতে পেল সবাই। 'কোথায় যাচ্ছ, ভাই?'

থেমে দাঁড়াল সে, চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কে, ওয়েসল?'

'হ্যাঁ।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল আঁদ্রেই। 'আর বোলো না, দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে। কুত্তার বাচ্চারা চশমা ভেঙে দিয়েছে আমার। বাবা কেমন আছে, ওয়েসল?'

'বাবা নেই, গুলি করে মেরেছে এরা। তবে একা মরেনি সে, যাওয়ার আগে ছয় এসএস শুয়োরসহ একটা ট্যাঙ্ক নিয়ে গেছে।'

'শাবাশ!' এবার শব্দ করে হাসল সে। 'শুয়োরের খোঁয়াড় খালি করতে বাবা সত্যিই খুব ওস্তাদ ছিল। যাই।' ঘুরে হাঁটা ধরল কথা শেষ করে।

'দেখা হবে, আঁদ্রেই!' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল ওয়েসল, চোখের কোণে অল্প অল্প পানি জমেছে। 'হয়তো কোন সাবানের কাউন্টারে কোনদিন...' কান্নায় গলা বুজে গেল তার, কথা শেষ করতে পারল না।

ওদিকে স্তূপের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে উলঙ্গ আঁদ্রেই। শীতে কাঁপছে হি হি করে। গুলি খাওয়ার একটু আগে ঘুরে তাকাল অন্ধের মত, মাথা নেড়ে পাল্টা হাঁক ছাড়ল। 'না, ভাই! আমি থাকব সুন্দরীদের দামী টয়লেট সাবানে, আর তুমি থাকবে লন্ড্রি সাবানে। কি করে দেখা হবে বলো?'

পরমুহূর্তে গুলি হলো, আছড়ে পড়া পাকা তরমুজের মত

বিস্ফোরিত হলো তার মাথা। হাড্ডিসার দেহটা হুমড়ি খেয়ে স্তূপের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুই স্বেচ্ছাসেবী লাঠি হাতে এগিয়ে গেল, কিন্তু ওয়েসল বাধা দিল মাঝপথে। 'তোমরা থাকো, আমি যাচ্ছি।'

তাকে শৃঙ্খলা ভাঙতে দেখে চেঁচিয়ে সতর্ক করল মেজর গ্রজ, জায়গায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিল। শুনল না সে, হাঁটার ওপর ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল, 'না, হের কোমান্ড্যান্ট। আমিই নিয়ে যাব ওকে। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম, জানেন না আপনি। কাউকে ছুঁতে দেব না আমি ওকে।'

রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল মেজরের। কিন্তু কথা না বাড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ, যাও। তবে এখানকার কাজ শেষ হলে আমার অফিসে রিপোর্ট করবে তুমি।'

'হয়ে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল তাদুয়েস ম্যান। 'ওটাও গেছে আজ। মেজর হারামজাদার রাগ বড় সাঙ্ঘাতিক।' শ্রাগ করল। 'দুর্ভাগ্য।'

ঘুমন্ত শিশুর মত সস্নেহে, আলতো করে ভাইয়ের লাশ তুলে নিল ওয়েসল। নরম, রক্তে মাখামাখি তুষার মাড়িয়ে পিটের দিকে চলল। সবাই তাকিয়ে আছে সেদিকে, দম নিতেও ভুলে গেছে। অনেক জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে দিয়ে জায়গামত পৌঁছল সে। এক স্টর্মট্রুপার কাছে এসে দাঁড়াল, শেমিসার রেডি।

বিড়বিড় করে কিছু বলল ওয়েসল, বোধহয় প্রার্থনার বাণী হবে। তারপর একটু ঝুঁকে দেহটা ছুঁড়ে দিল পুড়ে লাল হয়ে ওঠা লোহার বিছানায়। লকলকে আগুনের তাপে মুহূর্তের মধ্যে কুঁকড়ে গেল ওটা, নড়েচড়ে উঠল। মনে হলো যেন কোন অলৌকিক উপায়ে নতুন জীবন পেয়েছে। সেদিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল ওয়েসল, আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে বিষণ্ন মুখ।

চোখ মুছে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর, চিন্তার চাইতেও দ্রুতগতিতে খপ্ করে ধরে বসল ট্রুপারের ইউনিফর্ম কলার।

সশব্দে আঁতকে উঠল লোকটা, একেবারে অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা এমনই ভড়কে দিয়েছে যে আগে কলার ছাড়াবে না অস্ত্র তুলবে, দিশে করে উঠতে পারল না ক্ষণিকের জন্যে। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল যুবক।

জোর এক ঝাঁকি দিয়ে নিজে হেলে পড়ল পিটের দিকে, তারপর মারল হ্যাঁচকা এক টান। সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে কেউ বাধা দেয়ার কথা ভাবার সময়টাও পেল না। তীব্র আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ট্রুপার, কিন্তু শেষ করতে পারল না, দু'জন একযোগে হুড়মুড় করে পড়ল আঁদ্রেইর পাশে। পলকে আগুন ধরে গেল ওদের কাপড়ে, চুলে, সারাদেহে।

মরণ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে উঠে আসার চেষ্টা করল এসএস, পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া দু'হাতে পিটের কিনারা আঁকড়ে ধরে হাঁচড়পাঁচড় করতে লাগল। কিন্তু কাজ হলো না। ঘটনা দেখে পাথরের মত চেহারা হলো স্টার্মব্যানফিউরার গ্রজের, গ্লাভস খুলছে ব্যস্ত হাতে। তারপর এক ঝট্‌কায় ওয়ালথার বের করেই ট্রিগার টেনে দিল ট্রুপারের মাঝ কপাল সই করে, খুদে দুই ফুটন্ত পিটের মাঝখানে। একটু আগেও ও দুটো সুন্দর নীল চোখ ছিল। গড়িয়ে দু'ভাইয়ের ওপর চিৎ হয়ে পড়ল সে।

ভয়ঙ্কর অশুভ নীরবতা চেপে বসল বধ্যভূমিতে। কেউ নড়ছে না।

'কাউকে না কাউকে পস্তাতে হবে এ জন্যে,' মেজরের থমথমে চেহারার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল তাদুয়েস ম্যান।

রাহাত খান বলল না কিছু। অপলক চোখে পিটের দিকে চেয়ে আছে।

বাকি যারা ছিল, কয়েক ঘণ্টার আয়ু বাড়ল তাদের। ফায়ারিঙ স্কোয়াডের কাজ দুপুর পর্যন্ত স্থগিত রেখে ফিরে গেল মেজর।

নতুন সন্ডারকোমান্ডোদের অন্য কাজ দেয়া হলো। একটু পর

আরও নতুন বন্দী আসছে, তাদের মধ্যে মৃত কেউ থাকলে লাশ পিটে নিয়ে ফেলতে হবে। রাহাতসহ দশ-বারোজন সেই বিশালদেহী সর্দারের সাথে ক্যাম্পের মেইন গেট সংলগ্ন রিসিভিং স্টেশনে এল। এরমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে লোকটার নাম কযিনস্কি। ম্যানের ডিউটি কোথায় পড়েছে জানা হলো না রাহাতের।

একটু পর বন্দী নিয়ে পৌঁছল ট্রাক বহর। ক্যাটল ট্রাক। তার দৈর্ঘ্য দেখে চোখ কপালে উঠল রাহাতের। আসছে তো আসছেই। এক সময় শেষ হলো মিছিল। একটা একটা করে খোলা হতে লাগল ওগুলোর ব্যাকডোর, ভেতর থেকে স্রোতের মত নামতে থাকল মানুষ—কোলের শিশু থেকে থুত্থুড়ে বুড়ো, সবাই আছে তার মধ্যে। চিৎকার, কান্নাকাটি, ডাকাডাকি, এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি, এবং তার মধ্যে ট্রুপারদের কথায় কথায় একে-তাকে বেপরোয়া মারধর, সব মিলিয়ে এমন বিশৃঙ্খল, হুলস্থুল কাণ্ড যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

একটুপর মাইক্রোফোনে তীক্ষ্ণ এক কমান্ড ভেসে আসতে কিছুটা শান্ত হলো পরিস্থিতি। একই কমান্ড করছে ওটা বারবার। 'জুডেন, রাউস! জুডেন, রাউস! শেনেল, শেনেল! (ইহুদী, লাইনে দাঁড়াও! জলদি!)।

রাহাতের কয়েক হাতের মধ্যে এক মোটাসোটা, ধীরগতি মহিলার নিতম্বে শেমিসারের বাঁট দিয়ে জোরে গুঁতো মেরে বসল এক ট্রুপার। দাঁত খিঁচিয়ে আরেক খোঁচা লাগাল পেটে। 'লাইনে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে কানে যায় না?'

'দাঁড়াও না, বাপু, যাচ্ছি তো!' ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল মহিলার। 'বাচ্চার গরম কাপড়ের ব্যাগটা নিতে দাও!'

খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল এসএস। মায়ের পাশে দাঁড়ানো ভীত-সন্ত্রস্ত আট-নয় বছরের মেয়েটিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ওরে ইহুদীর বাচ্চা, বলে কি!' মাথা দোলাল। 'যেখানে যাচ্ছ, সেখানে

না তোমার, না তোমার মেয়ের, কারও কিছু দরকার হবে না, বুঝলে?'

'তার মানে?'

জবাবে সৈনিক কি বলল শোনা হলো না ওর হৈ-চৈর কারণে, তবে মহিলার প্রতিক্রিয়া দেখল ঠিকই। মুহূর্তে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল তার চেহারা। কিছু সময় অনড় দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরল, হাইহীলের ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ তুলে একটু দূরে দাঁড়ানো এক তরুণ সে. লেফটেন্যান্টের দিকে এগিয়ে গেল।

তার চেহারা দেখে কিছু সমস্যা হয়েছে অনুমান করে নিল অফিসার, খটাশ্ করে নাজি স্যালুট ঝেড়ে দিল। 'হাইল হিটলার, ফ্রয়লাইন (ম্যাডাম)!'

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল মহিলা। স্যালুটের জবাব দিল। 'হাইল হিটলার!'

'আপনার জন্যে কি করতে পারি, ম্যাডাম?' অফিসারের পিছনে দাঁড়ানো কয়েক এসএস ট্রুপার তার কৌতুক দেখে হাসছে নীরবে।

'ওই লোকটা···ওই যে, ও বলছে এখানে নাকি আমাদের সবাইকে গুলি করে মারা হবে। তারপর আগুনে পোড়ানো হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগল অফিসার, ভাব করল, 'দেখো দেখি কি যা-তা বলে' গোছের। 'ম্যাডাম, আমাদের এত জঘন্য মনে হয় আপনার? ও ঠাট্টা করে বলেছে। যান, আপনি ব্যাগ নিয়েই যান। কাপড়-চোপড় সঙ্গে না রাখলে বাচ্চার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

আবার ঘুরল মহিলা। আশ্বস্ত হতে চাইল, কিন্তু কেন যেন পারল না। সৈনিকরা সবাই কেন হাসছে, তাও বুঝল না।

পোল্যান্ড অনেক বড় দেশ। প্রায় পাঁচকোটি জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ইহুদী। দেশের সবখান থেকে রোজ প্রচুর ইহুদী

গ্রেফতার করছে এসএস, বদ্ধ ট্রাকে করে নিয়ে আসছে এখানে। দূর দূর থেকে পৌঁছতে দু'দিন, এমনকি তিনদিনও লাগে।

ফল যা হওয়ার তাই হয়। প্রচুর মানুষ মারা যায় পথে। বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ আর শিশুরা। ক্যারিয়ারের পাটাতনে পুরু হয়ে জমে থাকা তীব্র ঝাঁঝাল পেশাব আর মলের মধ্যে থেকে তাদের লাশ টেনে নামানো, তারপর পিট পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া যে কত কঠিন, টের পেতে বেশি সময় লাগল না রাহাত খানের। তবু মুখ বুজে কাজ করে গেল ও।

ভেতরের ইস্পাত কঠিন এক প্রতিজ্ঞা মেশিনের মত কাজ করিয়ে নিল ওকে দিয়ে। তা হলো, যত শীঘ্রি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে। বাইরের পৃথিবীর এই নরকে কি হয়, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, প্রায় কিছুই জানে না তারা। পালিয়ে গিয়ে জানাতে হবে। যদিও এসব জঘন্য, নৃশংস ঘটনা মানুষ কতখানি বিশ্বাস করবে জানে না, তবু ওকে ওর দায়িত্ব পালন করতে হবে। এবং যা করার দ্রুত করতে হবে, এসব দেখে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ার আগেই।

মুখ বুজে কাজ করছে মেজর, চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে দূরের মেয়েদের ক্যাম্পের সামনে। প্রচুর মেয়ে ওখানে, ওদের মধ্যে আনাকে খুঁজছে। যদি দেখা পাওয়া যায় মেয়েটার, যদি কোনমতে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়, যদি ওর কাছ থেকে বিজ্ঞানীর খোঁজ বের করা যায়, যদি…।

শেষ বিকেলের দিকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল রাহাত। হাত-পা আর চলে না, আড়ষ্ট হয়ে আসছে। মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে চাইছে না। তবু যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে বোঝা টেনে চলেছে। স্রেফ ট্রেনিঙ, নীতি-আদর্শ, মনের জোর আর উদ্দেশ্য পরিচালনা করছে ওকে।

সকালের ব্যাচের যে ক'জন বেঁচে গিয়েছিল, মেজরের নতুন নির্দেশে তাদের চিমনির কাছের নিচু ছাদওয়ালা বিল্ডিঙের দিকে

নিয়ে যাওয়া হলো। তার সাথে নতুন আসা কয়েকশো বৃদ্ধ, শিশু ও অচলকেও। পরে জেনেছে রাহাত, ওটা ক্রিমেটোরিয়াম ওয়ান। টু আর থ্রীও আছে ওখানে, একই ছাদের নিচে। সিলিঙে সেট করা আছে কয়েক হাজার কৃত্রিম শাওয়ার। পানি নয়, গ্যাস স্প্রে হয় ওগুলো দিয়ে।

ওর মধ্যে ঢোকাবার আগে যার যা আছে, সব খুলে ফেলতে বাধ্য করা হলো। কারণ জানতে চাইল কেউ কেউ, বলা হলো, ভেতরের শাওয়ারে গোসল করে নিতে হবে সবাইকে। লম্বা সফরের ক্লান্তি দূর হবে তাতে। কিন্তু তারপর কি ঘটেছে দেখার সুযোগ হয়নি রাহাতের। শুধু গুলির আওয়াজ শুনেছে ও দূর থেকে। বিল্ডিঙের পেছনদিক থেকে আসছিল। সারা বিকেল গুলি ফুটেছে ওখানে, একটার পর একটা, নিয়মিতভাবে। টানা সন্ধে পর্যন্ত।

ঠিক পাঁচটায় সাইরেন বেজে উঠল। সমস্ত তৎপরতা থেমে গেল অশউইৎজের। হাটের দিকে পা চালাল বিধ্বস্ত রাহাত। আর চলছে না। কিন্তু ব্যারাকের সামনে এসে বোকা হয়ে গেল। কোনটায় ঢুকবে ও? কোনটায় ছিল কাল রাতে খুন হওয়া লোকটা? সব হাট তো একই রকম দেখাচ্ছে! ব্যস্ত হয়ে ম্যানের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

এমন সময় কাপো কযিনস্কি চেঁচিয়ে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কার্পেন্টার আছে কেউ? থাকলে হাত তোলো। মেয়েদের ক্যাম্পে কিছু কাজ পড়েছে। কাজ শেষে বোনাস হিসেবে যাকে খুশি ইয়ে করতে পারবে। অবশ্য ইরমা লিন্‌যের চোখে পড়ে গেলে কপালে কি ঘটবে আমি জানি না। আছ কেউ?'

কোনকিছু চিন্তা না করেই হাত তুলে বসল ও। আনার সাথে দেখা করার একটা চান্স খুঁজছিল মনে মনে, তা যে এভাবে আসবে, বিশ্বাস করতে যদিও ভরসা হলো না। একটু পর ওকেসহ পাঁচজনকে নিয়ে দুই ক্যাম্পের মাঝের ব্যারিয়ারের দিকে এগোল

সর্দার। ওপাশের এসএস গার্ডদের হাতে দলটাকে তুলে দিল। ওখান থেকেই ওদের কাকে কোন হাটে যেতে হবে দেখিয়ে দিল তারা, তারপর দেশে থাকলে বড়দিনে কে কি করত সেই গল্পে মেতে উঠল।

আঁধার পুরো চেপে বসতে পারেনি তখনও। হাঁটার ফাঁকে দ্রুত ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাচ্ছে রাহাত। কোনটায় আছে আনা? ভাবছে ও, কত নম্বর হাটে? কি করে কথা বলা যায় ওর সাথে? চারদিকে প্রচুর মেয়ে, সবাই ন্যাড়া, জ্যান্ত কঙ্কাল সব। আনার শুধু ছবিই দেখেছে ও, ন্যাড়া মাথার আনাকে দেখলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। তবু হাল ছাড়ল না, নিচু স্বরে শিস বাজাতে লাগল 'রুল ব্রিটানিয়ার' সুরে। আশা করছে ওকে চিনতে পারবে মেয়েটা এই সুর কানে গেলে। বিশেষ পরিস্থিতিতে পরিচয় আদান-প্রদানের এই পদ্ধতি কর্নেল বীকনের উদ্ভাবন করা, স্ট্রাইক ফোর্সের সবাই জানে।

অনর্থক দেরি করার উপায় নেই, কাজেই ভেতরে ঢুকে পড়তে হলো ওকে। কিছুটা হতাশ হলেও ভেতরের মেয়েদের কাছে থেকে কায়দা করে ওর খোঁজ বের করা যেতে পারে ভেবে নিরাশ হলো না রাহাত। কিন্তু তাও হলো না শেষ পর্যন্ত। রোল কলের ঘণ্টা পরে গেল ও ভেতরে ঢোকামাত্র। দু'একজন যাও বা ছিল, এক এক করে চলে গেল রোবটের মত আড়ষ্ট, ধীর পায়ে। চকচকে কাঁচের চোখে রাহাতকে দেখল ওরা এক পলক। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ওদের কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। করলেও কেউ শুনতে পেত কি না কে জানে?

কাজে লেগে পড়ল রাহাত। তেমন কঠিন কিছু নয়, তিনতলা খাটের কয়েকটা নড়বড়ে হয়ে গেছে, কিছু পেরেক মারতে হবে। দশ মিনিটও লাগবে না সারতে, কিন্তু ও প্রচুর সময় লাগাল। কারও না কারও ফিরে আসার আশায় সামনে কাঠ পিটিয়ে সময়

নষ্ট করতে লাগল। কিন্তু মিনিট পনেরো পরও যখন কারও দেখা পাওয়া গেল না, হাল ছেড়ে দিল। গুছিয়ে নিল যন্ত্রপাতি। আর দেরি করা ঠিক হবে না, গার্ড সন্দেহ করে বসতে পারে।

বেরিয়ে আসার আগে কাজ ঠিকমত সারা হয়েছে কি না চেক্ করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মৃদু 'ক্যাঁ-অ্যা-চ্!' আওয়াজ উঠল ওপাশের এক দরজার হিঞ্জে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল। ঘুরে তাকাল রাহাত, এক মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। দরজা বন্ধ করে এদিকেই আসছে সে। এক মুহূর্ত লাগল মেয়েটিকে চিনতে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেল ও।

ছবিতে দেখা মেয়েটির সাথে কোনমতেই মেলানো যায় না। যথেষ্ট সুন্দরী ছিল আনা কাইবাল্টনা, অথচ এ মুহূর্তে রাহাতের সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখলে ভয় হয়। করুণা জাগে মনে। ন্যাড়া মাথার এক পাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে দগদগে ঘা। মনে হয় কেউ প্রচণ্ড আক্রোশে গোড়াসুদ্ধ একমুঠো চুল উপড়ে ফেলায় ওই অবস্থা হয়েছে। বাঁ চোখ পুরো বন্ধ, ফুলে আছে। চোখের পাতাসহ কপাল আর গালের এক অংশ জুড়ে গাঢ় কালসিটে—খুব সম্ভব ঘুসির চিহ্ন।

সুন্দর ঠোঁটের এক পাশ বিচ্ছিরিভাবে ফুলে-ফেটে আছে। নিচেরটার অনেকখানি কাটা, হালকা রক্ত লেগে আছে ওখানে। ইউনিফর্ম বুকের এক জায়গায় ছেঁড়া, ফর্সা বুকের অনেকখানি দেখা যায়। ভেতরের কষ্ট যাতে চেহারায় না ফোটে, মরিয়া হয়ে সেই চেষ্টা করল ও, কিন্তু আনার এক চোখের দৃষ্টি আর কথা শুনে বুঝল একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

'খুব দুঃখিত, মিস্টার খান,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল মেয়েটি। এক খাটের পায়া ধরে সামলাচ্ছে নিজেকে, দুর্বল পা কাঁপছে। 'বাইরে ছোট ছোট ওয়াটার পূল আছে, ওতে নিজের চেহারা দেখতে পাই। জানি কত বাজে দেখায় এখন আমাকে।'

জোরে জোরে দম নিল আনা। 'এখানে আসার সময় আমার

পাশ দিয়েই এসেছেন আপনি। আরও আগেই আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু…রোল কলের জন্যে…যাক্, কখন এসেছেন আপনি, কিভাবে? আচ্ছা বাদ দিন, বলতে হবে না। লুবানস্কি একত্রিশ নম্বর হাটে আছেন। এখনও সুস্থই আছেন, কিন্তু গেস্টাপো তাঁর পরিচয় জেনে গেলে কি হবে জানি না। যে ভাবে পারেন বের করে নিয়ে যান ওঁকে, মিস্টার খান। আমার জন্যে…'

থেমে দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল মেয়েটি। 'আমাকে যেতে হবে। এটা আমার হাট নয়, কেউ দেখে ফেললে…'

'কে এই অবস্থা করেছে তোমার?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রাহাত।

'আমি করেছি।'

জবাবটা তৃতীয় কাউকে দিতে শুনে চমকে ঘুরে তাকাল ও। আনা কুঁকড়ে গেল ভয়ে, দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল। প্রথমে চকচকে পালিশ করা একজোড়া জ্যাকবুটের ওপর চোখ পড়ল রাহাতের, তারপর কালো স্কার্টের ওপর।

একটা মেয়ে! খাটের ওপাশে, কখন এসেছে টেরই পায়নি ওরা। ঘুরে এপাশে এসে রাহাতের মুখোমুখি হলো সে। আনা তার বাঁদিকে একইভাবে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে ভয়ে।

'কেন, অন্যায় করেছি বুঝি?' বাঁকা হাসি দিল মেয়েটি।

তাকে দেখল রাহাত। প্রায় ওর সমান সে, কিন্তু পাশে দ্বিগুণ। চর্বি নয়, দেহের গঠনই চওড়া তার। চমৎকার চেহারা, তবে কিছুটা পুরুষালী ভাব আছে। বড় বড় নীল চোখ, ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। সোনালী চুল সুন্দর করে টেনে ঘাড়ের কাছে কালো সিল্কের রিবন দিয়ে বাঁধা। তার ওপর বসানো আছে হাই পীকড্ ক্যাপ। বিশাল দুই বুক, ভারী নিতম্ব।

খুব বেশি হলে চব্বিশ হবে বয়স। ঠোঁটে কড়া লাল

লিপস্টিক। নিঃশ্বাসে হুইস্কির বদ্ গন্ধ। কলারের ব্যাজ দেখে বোঝা গেল ওবেরস্টার্মফিউরার (লেফটেন্যান্ট) সে। জবাব না পেয়ে হাসল অফিসার।

'তো, দুই ইহুদী শিট্ মিলে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল, কেমন? পালাবার বুদ্ধি পাকাচ্ছিলে? এ জন্যে পস্তাতে হবে তোমাদের, শিট্। নয়তো আমার নাম ইরমা লিনয নয়।'

আজই প্রথম, তাই নামটার পুরো মাহাত্ম্য বুঝল না মেজর রাহাত। ইরমা অশউইৎজের এক জান্তব দুঃস্বপ্নের নাম। ত্রাসের নাম। তিনজন সমর্থ পুরুষের খাবার প্রতি বেলায় সাবাড় করে সে, ইচ্ছে হলেই যাকে-তাকে নিয়ে বিছানায় যায়। সে নিচু র‍্যাঙ্কের অফিসার-জোয়ান হোক বা বন্দী, পরোয়া নেই। এবং ইচ্ছেটা তার দিনের মধ্যে কয়েকবারই জেগে থাকে। তার যথেচ্ছ ব্যাভিচারের কথা বার্লিনেও কারও জানতে বাকি নেই।

সেক্সুয়ালি পারভার্টেড। পূর্ণ তৃপ্তি না পেলে বন্দীদের গুলি করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করে না। বিছানায় ওঠার সময় পরনে কিছু না থাকলেও হাতে ওয়ালথার ঠিকই থাকে। মেয়ে বন্দীদের অকারণে কষ্ট দিয়ে মজা পায় ইরমা, তাদের কাঁদতে দেখলে হাসে। সব সময় স্টীল টিপড্ চাবুক হাতে থাকে, ওটা ব্যবহার করে নির্দয়ভাবে। মেয়েরা দূরের কথা, পুরুষ বন্দীরাও তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না।

'একে মেরেছি, কারণ আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পুরো ঝোঁকেনি,' বলে উঠল লেফটেন্যান্ট। 'উপযুক্ত সম্মান জানায়নি আমাকে। কেন, সে জন্যে রাগ হচ্ছে নাকি তোমার, শিট্?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে রাহাতের। অসহ্য লাগছে ইরমাকে। হাতুড়ি ধরা ডানহাত দেহের পিছনে আছে, ইচ্ছে করলে এক বাড়িতে ছাতু করে দিতে পারে তার মাথা, কিন্তু তাতে সমস্যা বাড়বে ভেবে সামলে নিল অনেক কষ্টে।

'না না, ফ্রয়লাইন লিনয,' রীতিমত কুর্নিশ করে বলল ও।

'আপনার ওপর রাগ করার প্রশ্নই আসে না। আপনি ঠিকই করেছেন, উচিত কাজ করেছেন। ওরই দোষ, যোগ্য সম্মান দেয়নি ও আপনাকে।'

বিনীত হাসি হাসল। 'মাফ করবেন, ফ্রয়লাইন্। ও আসলে আমার পাড়ার মেয়ে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, তাই দুটো কথা বলছিলাম।'

সন্তুষ্টি ফুটল মেয়েটির চেহারায়, তবে সামান্য। এ ধরনের তেলতেলে কথাবার্তার সাথে ভালই পরিচয় আছে তার।

চাবুকের হাতল রাহাতের থুতনির নিচে বাধিয়ে মুখটা ওপরে তুলল সে, চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। 'তোমাকে তো আর-সব শিটের মত লাগছে না, শিট্!' মুচকে হাসল। 'অনেক তরতাজা মনে হচ্ছে! গুট্, ভাবছি তোমাকে তোমার অপরাধ খণ্ডনের একটা সুযোগ দেব কিনা। কি বলো তুমি, শিট্?'

প্রমাদ গুণল ও। ঢোক গিলল ইরমার অগোচরে। 'নিশ্চই! নিশ্চই, ফ্রয়লাইন।' মুখে যা-ই বলুক, মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় খুঁজছে ও মরিয়া হয়ে।

'কত নম্বর হাটে আছ তুমি?'

'আটাশ নম্বরে, ফ্রয়লাইন,' যেটা মুখে এল, বলে বসল ও।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'ডাক পেলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে আমার হাটে।' জবাবের অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিদ্যুৎগতিতে হাত চালাল আনার আনত মুখ সই করে। আওয়াজটা হলো প্রায় পিস্তলের মত, জোড়া লেগে আসা কাটা ঠোঁট পুরো হাঁ হয়ে গেল মেয়েটার, দরদর করে রক্ত বেরিয়ে এসে থুতনি ভাসিয়ে দিল। এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো ও মারের ধাক্কায়, গুঙিয়ে উঠে মুখ চেপে ধরে বসে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলেছে।

'কখন পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়, শেখো, পোলিশ

আবর্জনা!'

গট্ গট্ করে ভারী নিতম্ব দুলিয়ে চলে গেল ইরমা লিনয। পিছনে অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগল রাহাত। 'চলে যান,' আস্তিন দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল আনা। 'বিজ্ঞানীকে নিয়ে আজ রাতেই পালিয়ে যান।'

জবাব না দিয়ে লিনযের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল রাহাত। চাউনিতে চাপা তুষের আগুন। মেয়েরা একে একে ফিরে আসতে শুরু করেছে দেখে ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে সিধে হলো। ভাবছে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। লেফটেন্যান্ট হয়তো জানে না আনার হাট নাম্বার, অথবা খেয়ালই করেনি ব্যাপারটা। করলে হয়তো অন্যরকম কিছু ঘটত। নিজের হাট ছেড়ে অন্য হাটে আসার অপরাধে হয়তো গুলিই করে বসত মেয়েটিকে।

'আবার দেখা হবে,' বিড়বিড় করে বলল ও, কাছের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল অসহনীয় আর্কটিক হিমের মধ্যে।

রাতের খাবার বিসর্জন দিল ও তাদুয়েস ম্যানের পরামর্শে। পানির মত বাঁধাকপির এক বাটি সুপ, দু'পীস কালো রুটি আর এক মুঠো বীন, সব তুলে দিল সর্দার কযিনস্কির প্লেটে। কয়েদীরা যখন এসব করে, কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে করে, তা বোঝে লোকটা। তাই আড়ালে এসে রাহাতের উদ্দেশ্য জানতে চাইল। জেরি লুবানস্কি ওর বন্ধু, তার সাথে একটু কথা বলার সুযোগ চায় জানাল ও। এরমধ্যে তেমন ক্ষতিকর কিছু নেই দেখে রাজি হলো কযিনস্কি। পরদিন ভোরে বদলি করে দিল ওকে ৩১ নাম্বার হাটের কোমান্ডোদের দলে। জেরি লুবানস্কি আছে ওদের মধ্যে।

নাস্তার পর ব্রাঞ্চ রেললাইনের বরফ পরিষ্কারের দায়িত্ব পড়ল ওদের ওপর। বিজ্ঞানীর চেহারা চেনা আছে, কাজেই খুঁজে নিতে দেরি হলো না। কাজের ফাঁকে একটু একটু করে তার দিকে এগোল রাহাত। মৃদু গলায় ডাকল, 'জেরি লুবানস্কি!'

মুহূর্তের জন্যে তার বেলচা থেমে গিয়েই আবার চালু হলো। তবে কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। জবাব না দিয়ে কাজ করতে থাকল। তাকাল না।

'লুবানস্কি, আমি আপনাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

এবার তাকাল সে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়েও নিল চোখ। জবাব নেই, কাজ করে চলেছে নীরবে। কপাল কুঁচকে উঠেছে, কাজে মন নেই বোঝা যায়। চিন্তায় পড়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। ওদের সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাথরমুখো দুই এসএস। সবার ওপর চোখ নেচে বেড়াচ্ছে, শেমিসার কাঁধে নয়, হাতে। কালকের ঘটনার পর থেকে বিশেষ সতর্ক আছে ওরা প্রত্যেকে।

'লুবানস্কি, আমি...'

'কে আপনি?' এক বেলচা বরফ দূরে ছুঁড়ে মারল বিজ্ঞানী। সন্দেহের সুরে বলল। 'কাদের তরফ থেকে এসেছেন?'

প্রায় দুপুর লেগে গেল ওর বাকি কথা সারতে। কারণ হঠাৎ করে দু'জনকে বেশি কাছাকাছি মনে হওয়ায় আলাদা করে দিয়েছিল গার্ড, বিজ্ঞানীর প্রশ্নের জবাবে রাহাত মুখ খুলতে যাবে, ঠিক সেই সময়। ঠিক হলো, রাতে যখন ক্যাম্পের আলো নিভে যাবে তখন দেখা করবে ওরা।

ওয়ারশ, পোল্যান্ড।

ওই দিনই দুপুরে স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যানের একটা ব্যক্তিগত চিঠি পেল আন্টারস্টার্মফিউরার হেল্ড। অনেক পথ সফর করে হাতে হাতে এসেছে ওটা। পুরু কাগজের খাম, ওপরে ঝরঝরে ইংরেজিতে লেখা: স্ট্রিক্টলি ফর হিজ আইজ ওনলি।

সন্ধের মধ্যে সমস্ত ফাইল চেকিঙ সেরে ফেলল সে, সব গুছিয়ে রাখল। চিঠিটা ওয়েট চাপা দিয়ে রাখল ব্লটারের ওপর। সময় হলে জায়গামত চলে যাবে সব। মেজরের ফিরতে দেরি

আছে, চেকিঙ আরও দেরি করেও সারা যেত, কিন্তু মানুষটার ব্যাপারে আর সামান্যতম ঝুঁকি নিতেও রাজি নয় হেল্ড। কে জানে, তার কাজের অগ্রগতি দেখতে যদি ঠিক বড়দিনেই অফিসে এসে হাজির হয়?

সর্বনাশ যা হওয়ার হয়েছে, আর নয়।

ওই রাতেই সুয়্যার-ইন-চার্জের কাছে রিপোর্ট করল সে। এবং এমনই দুর্ভাগ্য যে ম্যানহোল দিয়ে টানেলে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়েই গেল। তলিয়ে গেল আট ফুট গভীর, বরফ ঠাণ্ডা মানুষের বর্জ্য শক্ত আর তরল পদার্থের মধ্যে।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০।

অশউইৎজে অন্যরকম চেহারা নিয়ে এল বড়দিন। ভোরের হাজিরা আধঘণ্টার জন্যে পিছিয়ে দেয়া হলো। কোন নতুন বন্দী এল না, একটা গুলিও ছোঁড়া হলো না, পিটের আগুনও জ্বলল না।

কালো ধোঁয়া বের হলো না চিমনি দিয়ে, মাংস পোড়া গন্ধের অত্যাচার থেকে একটা দিনের জন্যে মুক্তি পেল সবাই। রোল কলের পর ছুটি দিয়ে দেয়া হলো বন্দীদের। অন্যদিনের তুলনায় কিছুটা উন্নত খাবার দেয়া হলো।

আর সব যেমন-তেমন, আবহাওয়ার কারণে দিনটা বড় বাজে কাটল। আঁধার হয়ে থাকল, দুপুরের একটু পর শুরু হলো ঘন তুষারপাত। এতই ঘন যে দশ হাতের ওপাশে কিচ্ছু দেখার উপায় রইল না। হাটেই বসে থাকতে হলো বন্দীদের নিরুপায় হয়ে। অলস থেকে ঘরের কথা, পরিবারের কথা ভেবে কাঁদল তারা, প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথার শোক উথলে উঠল বুকের মধ্যে।

ইহুদী হলেও মুক্ত থাকলে প্রতিবেশী রোমান ক্যাথলিকদের সাথে বিশেষ এই দিনে তারাও আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠতে পারত। ঘুরে বেড়াতে পারত। প্রত্যেক বছর তাই করে এসেছে সবাই। এবার ব্যতিক্রম ঘটল। অনেকে সহ্য করতে পারল না সে

শোক।

আবছা অন্ধকারে প্রায়ই একে-তাকে দেখা গেল, ধীরপায়ে পেরিমিটার ফেন্সের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। একটু পর পরই ভেসে এল চিৎকার, বিদ্যুতের ঝল্‌সানি, সামান্য ধোঁয়া, তারপর সব চুপ। সবাই শোকে আচ্ছন্ন, কে কাকে বাধা দেয়?

পরদিন ভোরে বিদ্যুৎ সরবরাহ অফ করে প্রায় দেড়শো লাশ ফেন্স থেকে ছাড়ানো হলো।

এর একটু পর ফের ব্যস্ততা শুরু হলো। রুটিন নিয়মে ফিরে গেল অশউইৎজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। জীবন-মরণের ফারাক যেখানে সূক্ষ্মতম সুতোর চেয়েও সূক্ষ্ম। যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে–ছিঁড়ে যায়। সেই ক্যাম্প; যার মেইন গেটে বড় করে লেখা: আরবেইট মাখ্‌ট্ ফ্রেই। ওর একটু ওপরে কোন হতভাগা যেন চক দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেছে: নাখ্‌ট্ আন্ড নেবেল।

আট

সেদিন আবার মেয়েদের ক্যাম্পে ডাক পড়ল কার্পেন্টার দলের। আরও কিছু কাজ বাকি আছে। দুপুর পর্যন্ত একটানা পেরেক ঠোকার কাজ করল রাহাত স্যাঁতসেঁতে, পেশাবের দুর্গন্ধে ভারী এক হাটে। অসুস্থদের দেখার কেউ নেই অশউইৎজে, তাদের মধ্যে যারা একেবারে অচল, বাধ্য হয়ে প্রকৃতির তাড়না ভেতরেই মেটায় তারা। প্রত্যেকটা হাটের তাই কমবেশি একই অবস্থা।

দুপুরের খাবার ভেতরে খেতে হলো। খাওয়া শেষ হয়ে

এসেছে, এই সময় এক মেয়ে হেঁটে গেল সামনে দিয়ে। যাওয়ার পথে সন্তর্পণে এক টুকরো কাগজ ফেলে দিয়ে গেল ওর মেটাল বাউলে। চকিতে চারদিকে নজর বুলিয়ে ওটা খুলল রাহাত। আনার চিঠি। লিখেছে: অসুস্থ। হাট চোদ্দ। কথা আছে।

কি করে ওখানে যাওয়া যায় ভাবল রাহাত। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেল বুদ্ধি। খাওয়া শেষ করে উঠল। বেরিয়ে এসে এক মেয়ে কাপোকে জানাল, চোদ্দ নম্বর হাটে কাজ আছে, ওখানে যেতে হবে।

'যেখানে করছ সেখানেই করো গিয়ে,' রেগে জবাব দিল সর্দারনী। 'কাজ কোথায় আছে কোথায় নেই আমি বুঝব।'

শ্রাগ করল রাহাত। 'বেশ। ফ্রয়লাইন লিনযকে তাই বলি গিয়ে তাহলে।'

'মানে!' চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। 'ফ্রয়লাইনকে কেন...?'

'উনিই তো বললেন ওখানে যেতে।'

ম্যাজিকের মত কাজ করল নামটা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল কাপোর। 'দেখো দেখি, তা আগে বলবে তো! যাও যাও!' হাত তুলে হাটটা দেখিয়ে দিল। 'ওই যে, চোদ্দ।'

ওটার ভেতরে আরেক মেয়েকে দেখতে পেল রাহাত। দরজার কাছে এক লোয়ার বাঙ্কে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়ে আছে। চেহারা এতই ফ্যাকাসে, মনে হলো বেঁচে নেই। ঠিক তখনই কেশে ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করল মেয়েটি। মুখ দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে এল কাশির সাথে।

গত তিনদিনে এর চেয়ে হাজারগুণ বেশি করুণ দৃশ্য দেখেছে মেজর, তাই ভেতরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। অনুমান করল, আজই হয়তো এর শেষদিন। কাল ভোরে পিট হবে এর শেষ ঠিকানা।

আনার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল ও। হাটের মাঝামাঝি এক বাঙ্ক থেকে কাঠির মত শীর্ণ একটা হাত ইশারায় ডাকছে

দেখে দ্রুত এগোল। পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছতে কথা বলে উঠল আনা, 'আর কাছে আসবেন না, খান। ছোঁয়াচে...!'

থমকে গেল রাহাত ওর চেহারা দেখে। প্রথম দেখার সময় কষ্টে হলেও চেহারা চেনা গেছে, এখন সে উপায়ও নেই। বিছানার সাথে মিশে গেছে মেয়েটা। ভয়ঙ্কর কিছু একটার আভাস চেহারায়। অস্বাভাবিক কি যেন। কি?

শুকনো মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে ওর। নাকের ফুটোয় রক্ত। তাজা রক্ত। অস্বাভাবিক একটা গন্ধ পেয়ে আপনাআপনি কুঁচকে উঠল রাহাতের নাক। মাংস পোড়ার এবং হাটের ভেতরের সার্বক্ষণিক বদ গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে। বেশ কড়া। একটু পর বোঝা গেল ওটা কিসের। পেটের ভেতরে পচন ধরেছে আনার। সেই গন্ধ।

বাঙ্ক ঘেঁষে দাঁড়াল রাহাত, প্রচণ্ড আপত্তি উপেক্ষা করে হাত রাখল ওর কপালে। আগুনের মত গরম! মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, 'টাইফয়েড!'

মাথা দোলাল আনা। মলিন হাসি হাসল।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাবে তুমি,' বলার মত আর কিছু পেল না রাহাত। 'রেস্ট পেলে...'

'এখানে সে উপায় নেই,' কোনমতে বলল মেয়েটি। 'ওয়ারশয় হলে হয়তো কিছু করা যেত, কিন্তু...অশউইৎজে...'

চুপ করে থাকল ও জবাব দেয়ার কিছু নেই দেখে। যদি ঠিকমত পরিচর্যা, খাওয়া পায়, তাহলে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবে আনা কাইবাল্টনা। নয়তো মরবে। এখন যে অবস্থা, তাতে আর বড়জোর চার-পাঁচদিন বাঁচবে। একে নিয়ে কি করে পালাবে ও? এই অবস্থায়...।

দরজার কাছ থেকে সঙ্কেত দিল চিরকুট পৌঁছে দেয়া মেয়েটি, গার্ড আসছে। আশ্বস্ত করার জন্যে দ্রুত আনার হাতে চাপ দিল রাহাত। 'মনে জোর রাখো। তোমাকে সুস্থ হতে হবে, পালাতে

হবে এখান থেকে। পরে আবার আসব।'

'শুনে খুব খারাপ লাগছে,' মাথা দুলিয়ে বলল বিজ্ঞানী, জেরি লুবানস্কি। 'কিন্তু ওকে নেয়াই বা কিভাবে? আপনি যা বললেন, তাতে তো মনে হয় না মেয়েটা পালাতে পারবে। ও বরং সমস্যাই সৃষ্টি করবে আমাদের জন্যে।'

রাহাতকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'আমি খুব দুঃখিত, বন্ধু। কিন্তু ওকে নিয়ে কিছু করা সম্ভব হবে না। প্রয়োজন পড়লে আমরা দৌড়-ঝাঁপ করতে পারব, আনা পারবে না। বরং প্রতি পদে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।'

তাতে কোন সন্দেহ নেই, ভাবল ও। আনার চাইতে জেরি লুবানস্কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাকে মুঠোয় পাওয়া ইংল্যান্ডের জন্যে জরুরি। ওর জন্যে যদি বিঘ্ন ঘটে, যদি প্ল্যান কেঁচে যায়, তাহলে এত পরিশ্রম-ঝুঁকি সব মাঠে মারা যাবে। তাছাড়া স্ট্রাইক ফোর্সের নীতি হচ্ছে মিশন আগে, তারপর আর সব। কি করবে এখন রাহাত?

আনা খবর না দিলে ব্রিটেন কোনদিন জানত না লুবানস্কির কথা। তাকেই এখন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে যেতে হবে, মেনে নিতে পারছে না। লবকোউইস্কির কথা মনে পড়ল। ছেলেটা ওর ওপর অনেক ভরসা করে আছে। সেই প্যারিস পর্যন্ত ছুটে গেছে ওকে খবর দিতে। নিশ্চই আশা করে আছে রাহাত তার প্রেমিকাকে বের করে নিয়ে যাবে। যদি তা না হয়, ভীষণ কষ্ট পাবে বেচারী।

'বেশ,' অনেকক্ষণ পর বলল ও। 'এ ছাড়া করার আর আছেই বা কি! আমাদের এস্কেপ প্ল্যান চূড়ান্ত হওয়ার মধ্যে যদি ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় ভাল, নইলে...' থেমে শ্রাগ করল। বিজ্ঞানী কোন আপত্তি করল না দেখে আবার বলল, 'মেয়েটাকে বাড়তি দুয়েকটা কম্বল কোনমতে যদি পৌঁছে দেয়া যেত!

টাইফয়েডের রোগীকে ঠাণ্ডা থেকে সামলে রাখা খুবই জরুরি।'

'কত নাম্বার হাটে আছে আনা?' ঘুরে তাকাল বিজ্ঞানী।

'চোদ্দ।'

'আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে কিছু করতে পারি কি না।'

পরের তিনদিন পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে কাটাল রাহাত। রাত আটটায় এসএস ব্যারাক ছাড়া ক্যাম্পের সব আলো অফ করে দেয়া হয়। সুযোগটা কাজে লাগাল ও। ক্লান্তি ও অসহ্য শীত অগ্রাহ্য করে নজর রাখল পরিস্থিতির ওপর। কখন রাতের গার্ড শুরু হয়, কোন্ কোন্ পথে হাঁটে ওরা, তারওপর কড়া নজর রাখল। ভেতরের সেন্ট্রাল স্টোর কোথায়, ওখানে কি ভাবে মাল খালাস হয় ইত্যাদি কিছুই বাদ দিল না। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাত জেগে এতসব দিকে নজরদারি করতে খুব কষ্ট হলো, কিন্তু রাহাত হাল ছাড়ার বান্দা নয়। লেগে থাকল।

অবশেষে আবছা এক প্ল্যান মাথায় এল। ওটাকে ঘষেমেজে আরও চোখা করতে লেগে পড়ল ও।

এই ক'দিন পিটে কাজ করতে হয়েছে। তাদুয়েস ম্যানের সাথে কয়েকশো লাশ টানতে হয়েছে। একটু একটু করে চোখ-মন সয়ে আসছে ওর, এখন আর আগের মত বুক কাঁপে না লাশের ছড়াছড়ি দেখে। এ বরং ভালই হয়েছে, নইলে আসল কাজ করতে পারত না রাহাত।

এরমধ্যে কাপো কযিনস্কির সাথে মোটামুটি একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। লোকটা ওকে বলেছে, আগামী সপ্তাহ থেকে ওকে এই জঘন্য কাজ থেকে মুক্তি দেয়া যায় কি না, চেষ্টা করে দেখবে সে। ওদিকে জেরি লুবানস্কি ক্যাম্প প্রাঙ্গণের বরফ পরিষ্কার রাখার কাজে ছিল তিনদিন।

কোন ফাঁকে কি ভাবে যেন দেখা করেছে সে আনার সাথে। শুধু তাই নয়, দুটো বাড়তি কম্বল পৌঁছে দিয়েছে ওকে। এবং

রাহাতের জন্যে ওর একটা চিঠিও নিয়ে এসেছে। আনা লিখেছে: কম্বলের জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। এখন কিছুটা সুস্থ আছি। তবে শরীর দুর্বল। মেটরা যথাসম্ভব দেখাশুনা করছে।

ওটার উল্টোদিকে জবাব লিখে দিল রাহাত। লিখল: সুস্থ শুনে খুশি হয়েছি। ডিম ফোটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। দু'একদিনের মধ্যে সুখবর দিতে পারব।

জবাব নিয়ে চলে গেল বিজ্ঞানী। তার একটু পর পিছন থেকে এসে হাজির হলো তাদুয়েস ম্যান। হাট থেকে বেরিয়ে পিটে যাবে বলে পা বাড়িয়েছিল লোকটা। দূর থেকে সবই দেখেছে। 'প্রেমপত্র পাঠালে নাকি?' চাপা গলায় বলে উঠল। 'কাকে? দেখো, ব্রাদার, স্টার্মব্যানফিউরার টের পেলে কিন্তু সর্বনাশ!'

মনে মনে হাসল ও। 'পাবে না।'

মুখোমুখি দাঁড়াল এসে পোল। 'মেয়েটা কে, আমার চেনা কেউ?'

'হ্যাঁ, খুব চেনা। সবাই চেনে এখানকার। তুমি যদি চাও, আজ রাতে তার সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দিতে পারি গোপনে! কি বলো?'

চাউনি চক্‌চকে হয়ে উঠল লোকটার। 'সত্যি পারবে? কে, কে সে? নাম কি?'

'ইরমা লিনয।'

নামটা কানে যাওয়ামাত্র এমন হয়ে উঠল তার চেহারা, মনে হলো পেটে অদৃশ্য হাতের ভয়ঙ্কর ব্লো খেয়েছে। দ্রুত পিছিয়ে যেতে গিয়ে পড়েই গেল মানুষটা। হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে চোখ গরম করে তাকাল। 'তুমি ঠাট্টা করছ আমার সাথে?'

'আরে, ঠাট্টা হতে যাবে কেন? যা সত্যি তাই বলেছি।'

চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল সে অনেকক্ষণ। 'পিটে যেতে হবে, সে খেয়াল আছে?'

'চলো।'

সেদিন শুধু মেয়ে ও বাচ্চাদের ওপর চলল টোকেনকফের শূটিং। নির্বিকার চেহারায় দেখে গেল 'স্ট্রাইক ফোর্স' চীফ, মুখ বুজে কাজ করে গেল। মনের সমস্ত অনুভূতি আগেই বুকের ভেতরের এক সুরক্ষিত, গোপন জায়গায় তালাচাবি মেরে রেখেছে। এতই গোপন জায়গায় যে ও নিজে চাইলেও খুঁজে পাবে না এখন।

ওবেরস্টার্মফিউরার লিনয আজ অনেকটা সুস্থ। ক্রিসমাসের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এত গেলা গিলেছে, এতকিছু খেয়েছে যে শেষ পর্যন্ত অ্যাকিউট ফুড পয়জনিঙে আক্রান্ত হয়ে পুরো দু'দিন বিছানাতেই পড়ে থাকতে হয়েছে তাকে।

শুধু তাই নয়, সাথে আসল 'মজাও' ছিল। নিজের বাছাই করা আঠারোজন এসএস ট্রুপারকে নিয়ে মজা করেছে লিনয এক এক করে। একটুও ক্লান্ত হয়নি। বরং ট্রুপারদের ক্লান্তি দেখে হাসাহাসি করেছে। তারপর রাতে ঘুম ভেঙেছে অসহ্য পেট কামড়ানির যন্ত্রণায়। সে কী অসহ্য ব্যথা! সেই রাত এবং পরের তিনটে দিন বমি করে আর গুঙিয়ে কেটেছে লিনযের।

মেয়ে ক্যাম্পের খোঁজ নিতে পারেনি। আজ তাই বের হবে ঠিক করেছে। বিকেলে তৈরি হয়ে নিল লেফটেন্যান্ট, চাবুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাকে দেখামাত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল মেয়েদের মধ্যে, কুঁকড়ে গেল সবাই। কারও দিকে তাকাল না সে, চকচকে পালিশ করা জ্যাক বুটের ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ তুলে প্রতিটা হাটে চক্কর দিয়ে বেড়াতে লাগল। হাঁটার তালে চাবুক ঠুকছে পায়ের পাশে।

হাট চোদ্দয় এসে থমকে দাঁড়াল লিনয গোঙানি শুনে। চাবুক ঠোকা থামিয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। সব বাঙ্ক শূন্য, কেবল একটায়

সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ছে। সেদিকে এগোল। কাছে যেতে ভক্ করে একটা বদ গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল লিনয। গন্ধটা খুব চেনা, আর কাছে যাওয়া ঠিক হবে না।

ব্লক-লীডারের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে। 'ওটায় কোন্ শিট্?' মাঝবয়সী, স্থূল দেহের এক মেয়ে কাপো ছুটে এসে দাঁড়াতে বলল, 'কম্বল সরাও, মুখ দেখতে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে পালিত হলো নির্দেশ, কিন্তু লিনযের শকুন চোখ শিটের ওপর নয়, পড়ল কম্বলের ওপর। মুহূর্তে বিগড়ে গেল চেহারা। 'ক'টা কম্বল ওখানে?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল সে।

থতমত খেয়ে গেল কাপো। কাঁপা হাতে গুনল। 'তি-তিনটা, ফ্রয়লাইন!'

'এতবড় সৌভাগ্য কার চেহারাটা দেখতে দাও। আরও সরাও কম্বল।'

তাই করল কাপো। এবার এক পা এগিয়ে ঝুঁকে মেয়েটিকে দেখল লিনয তীক্ষ্ণ চোখে। একটু সময় লাগল চিনতে। ওটা আনা কাইবাল্টনা।

'বাড়তি কম্বল কি করে এল হাটে?' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

তাকে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল কাপো। 'আমি জানি না, ফ্রয়লাইন! ঈশ্বরের দোহাই, আমি দেখিনি। সত্যি...!'

অন্য এক চিন্তা মাথায় আসতে হাতটাকে সামাল দিল অফিসার। 'সত্যি বলছ?' মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল।

'সত্যি, ফ্রয়লাইন, সত্যি! আমি সত্যি জানি না!'

'আচ্ছা। ওকেই জিজ্ঞেস করো তাহলে কে দিয়েছে ওগুলো।'

চোখের পানি মুছে তাই করল সে। কয়েকবার জিজ্ঞেস করল আনাকে, প্রতিবার একই জবাব দিল সে—জানে না। হুঁশ ছিল না তার, কে গায়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছে দেখেনি।

কেন কে জানে, চট্ করে রাহাতের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল ইরমা লিনযের। এ নিশ্চই সেই হারামজাদার কাজ। কে লোকটা, এই হারামজাদীর প্রেমিক? দেখা যাক্, ভাবল সে। এতবড় গুরুতর এক অপরাধ, অথচ আনা বা কাপো, কাউকেই তাৎক্ষণিক কোন শাস্তি দিল না। শুধু হাট চোদ্দর সবার জন্যে বিশেষ এক ফরমান জারি করে বেরিয়ে এল।

কাপো স্তব্ধ হয়ে গেল শুনে। হাঁ করে লিনযের পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল সে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর আনার দিকে ফিরে মাথা দোলাল। 'তুমিও গেলে, সঙ্গে আরও কতজন যাবে কে জানে!'

আনা কিছুই বুঝল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কাপোর দিকে।

টহল সেরে নিজের কোয়ার্টার্সে ফিরে গেল লিনয। ছ'টা বাজে তখন। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় উঠল, কম্বলের তলায় ঢুকে হেলান দিয়ে বসল খাটের হেডবোর্ডের সাথে। বিশাল বুকের অর্ধেক বের করে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে ম্যাগাজিন ওল্টাতে লাগল। কাছেই সশব্দে জ্বলছে ঘর গরম রাখার স্টোভ।

একটু পর বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে হেরিঙ মাছের একটা ক্যান বের করে খুলল। পর পর দুটো মাছ পেটে চালান করে হুইস্কি গিলল খানিকটা, তারপর আবার ডুবে গেল ম্যাগাজিনের পাতায়। পুরো নয়, একটু একটু। অন্য কিছু ভাবছে মেয়েটি। তিনদিন, পুরো তিনটে দিন সত্যিকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত সে। আর কত? সেই তরতাজা ইহুদী শিট্‌কে দিয়ে শুরু করে দেয়া যাক্! তারপর···।

ঘড়ি দেখল অফিসার—সন্ধে সাড়ে ছ'টা বাজে। গুট্! এতক্ষণে নিশ্চই কাজ থেকে ফিরেছে ব্যাটা। থাবা দিয়ে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল, রিঙ করল মেজর গ্রজের সেক্রেটারি মেয়েটিকে।

রাহাত যে ভরসায় সেদিন যা-তা একটা হাট নাম্বার বলেছিল, তাতে কাজ হলো না। কারণ লিনযের আসল ব্রেন দেহের মাঝখানে হলেও ওপরেরটার কাজও চমৎকার। একবার রাহাতের নাম্বার দেখেই গেঁথে রেখেছে ওখানে।

ওটা এবং হাট নাম্বার, দুটোই মেয়েটিকে জানাল সে, কি করতে হবে নির্দেশ দিয়ে রেখে দিল রিসিভার। প্রথমে দেখা গেল হাটের সাথে বন্দীর ক্রমিক নাম্বার মেলে না, কাজেই ফ্রয়লাইনের কোন ভুল হয়েছে ভেবে শুধু পরেরটা জানাল সে কয়েক কাপোকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটাকে ওবেরস্টার্মফিউরারের কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দেয়ার হুকুম করল।

রাতের খাওয়া সবে শেষ করেছে রাহাত, এই সময় ওর নাম্বার ধরে ডাকল কযিনস্কি। 'খাওয়া হয়েছে?'

'কেন?'

'এক্ষুণি উঠে পড়ো হোক আর না হোক। আর কারও খোরাক হতে হবে এখন তোমাকে।'

'তার মানে?' খারাপ কিছু ঘটেছে আশঙ্কা করে বুক কেঁপে উঠল ওর। লুবানস্কির পরিচয় জেনে গেছে গেস্টাপো? দ্রুত ভাবল, তার সঙ্গে ওর গত কয়েকদিনের যোগাযোগের ব্যাপারটা কেউ ফাঁস করে দিয়েছে? নাকি আনা...

'আরে! এখনও বসে আছ তুমি?'

'কোথায় যেতে হবে?' কোনমতে বলল রাহাত।

'ফ্রয়লাইন লিনযের,' অশ্লীল একটা ভঙ্গি করল সে তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে, 'ওখানে।'

হি হি করে হেসে উঠল সবাই। নাকমুখ লাল হয়ে উঠল রাহাতের। বিস্বাদ লেগে উঠল মুখের মধ্যে।

'জলদি যাও,' তাড়া লাগাল কযিনস্কি। 'ফ্রয়লাইন রেগে উঠলে তোমাকে খুঁজতে ডুবুরীর দরকার হবে।'

আরেক চোট হাসির রোল উঠল। বেরিয়ে আসার সময় কাপোকে বলতে শুনল রাহাত, 'দু'পা খাটের পোস্টে বেঁধে নিতে ভুলো না যেন।'

পিছন থেকে হাঁ করে রাহাতের পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল তাদুয়েস ম্যান। ফ্রয়লাইন লিনয ১৮৭০১৬৪ কে ডেকে পাঠিয়েছে, বিশ্বাসই করতে পারছে না। তার মানে লোকটা যা বলেছিল তা সত্যি? কিন্তু…চিঠি দেয়ার কি দরকার ছিল?

বাইরে তুষারপাতের পরিমাণ আজ আবার বেড়েছে। মৃদু বাতাসও আছে সাথে। কাত হয়ে অঝোর ধারায় পড়ছে তো পড়ছেই। ঘাড় গুঁজে দ্রুত মাঝের ব্যারিয়ারের দিকে এগোল মেজর রাহাত। প্রথমদিন দেখা আনার চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। লিনযের ওর সাথে দাপট দেখানো, দুর্ব্যবহার এবং আনাকে মারা চড়টার কথা ভাবছে।

সেদিনই রাহাত প্রতিজ্ঞা করেছে এর প্রতিশোধ নেবে। আজ কি হবে সে সুযোগ? মেয়ে ক্যাম্পের গার্ড হাঁক ছাড়ল ওকে দেখে। 'এই ব্যাটা, এখানে কি?'

'ফ্রয়লাইন লিনয ডেকেছেন,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও।

'ও, আচ্ছা।' তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ব্যারিয়ার তুলে দিল ট্রুপার। 'যাও। তবে সাবধান, ম্যাডামকে যদি সন্তুষ্ট করতে না পারো, তাহলে কিন্তু,' তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করল। 'ঠুস্!'

মাথা ঝাঁকাল ও। দ্রুত লিনযের কোয়ার্টার্সের দিকে পা বাড়াল। মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। এরমধ্যেই ভুরুতে তুষার জমে গেছে ওর, দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে সশব্দে। দরজায় নক্ করল।

'কম (কাম)!'

ঢুকল ও। আগের মতই খাটে বসা লিনয। ভেতরের রাগ

চেপে রেখে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। বুক প্রায় পুরোটাই উদোম, চুল এলোমেলো। ঘরের বদ্ধ পরিবেশে হুইস্কি আর সিগারেটের জমাট বেঁধে থাকা কড়া গন্ধে নাক কুঁচকে উঠতে যাচ্ছিল রাহাতের, সামলে নিল। ঘুরে দাঁড়াল দরজা লাগিয়ে। ঘরের যাবতীয় কিছুর ওপর চকিতে চোখ বুলিয়ে নিল।

– দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক শুধুই চোখ বুলিয়েছে ও, ভাল করে দেখেনি কিছু। আসলে একেবারেই উল্টো, কড়া ট্রেনিং পাওয়া চোখ সবই দেখেছে, কিছু বাদ যায়নি।

'মিয়েন ডিউন জুডেন (আমার শুকনো ইহুদী)!' হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে বুকের বাকি আড়ালটুকুও খসিয়ে ফেলল লিনয। 'জলদি! স্টোভের সামনে বসে গরম হয়ে আমাকে গরম করতে এসো।'

ওর ওয়ালথারটা কোথায়? ভাবল রাহাত, এখনও কোমরে? স্টোভের কাছের এক চেয়ারে বসে আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

'তোমার সাহস তো কম নয়, আমার সামনে চেয়ারে বসো!' বলল বটে সে, তবে হাসিমুখে। কম্বলের তলা থেকে ওয়ালথার ধরা হাত বের করল, ওটার নল তাক করল রাহাতের মাঝ কপাল বরাবর। 'কেমন হয় এখন যদি গুলি করি?' মুখে হাসি, অথচ চাউনি ধক্ ধক্ করছে। বোঝা যায় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে। মতলব ভাল নয়।

হাসতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল ও। ভাবল, তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। লিনযের মত দেখতে মানুষ হলেও জানোয়ার সবই পারে। শ্রাগ করল, তারপর চোস্ত জার্মানে বলল, 'কি আর হবে? একটা দুর্লভ সম্মান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে আমাকে।'

দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত হলো লিনযের। 'তুমি জার্মান

শিট্!' হেসে উঠল নির্লজ্জের মত। 'তাহলে তো ডবল দুর্লভ সম্মান। এসো তাহলে, শিট্, মরার আগে সুপিরিয়রের সাথে মউজ করে সাধ মিটিয়ে যাও।'

এক ঝট্‌কায় গায়ের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে ফেলল মেয়েটা, ঝাঁকি লেগে বিশাল বুক দুলে উঠল। ঘৃণায় রি রি করে উঠল মেজরের গায়ের মধ্যে। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল।

টের পেয়ে রাগে ঝল্‌সে উঠল লিনয। হিসিয়ে উঠল, 'কমেন সিয়ে (কাম অন), ভীতু শিট্! অনেক বড় ফেভার করছি আমি তোমাকে। অনেক বড়। কাজ সারা হলে অশউইৎজ ছেড়ে যাওয়ার সবচে' সহজ পথও দেখাব আজ তোমাকে।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিল ও। 'গুলি করবেন?'

'নিশ্চই! পোলিশ হোক বা জার্মান, শিট্ সবসময়ই শিট্। ওদের সাথে কি আচরণ করা হয় এখানে দেখোনি? তোমার চর্বির তৈরি সাবান দিয়ে গোসল করব আমি বছরের পয়লা দিনে। কম!'

'কিন্তু হের কোমান্ড্যান্ট হয়তো পছন্দ করবেন না ব্যাপারটা।'

'হ্যাঁ। আমাদের প্রিয় হের কোমান্ড্যান্ট পছন্দ করেন না আমাকে, কিন্তু হু কেয়ারস্? আমি বলব তুমি আমাকে রেপ করতে ভেতরে ঢুকেছিলে,' এক চোখ টিপল। 'জানি, কেউ সে কথা বিশ্বাস করবে না। কারণ সবাই জানে এখানে উল্টোটাই ঘটে। তবে ভেবো না তাই নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে আসবেন তিনি।'

দ্রুত ভাবতে লাগল রাহাত। বুঝতে পারছে সময় ফুরিয়ে আসছে, সে ওরই হোক কি বেশ্যা লিনযের। কার, সেটা এখনই ঠিক করতে হবে রাহাতকে। সময় নেই। সময় নেই। ওর দেরি দেখে আরও খেপে উঠল মেয়েটা, ঝট্ করে বিছানা থেকে নেমে ওয়ালথার ঠেসে ধরল কপালের পাশে। চেহারা রাগে লাল।

'জল্‌দি কর, হারামজাদা! আজ তুই এমনিও মরবি, অমনিও মরবি। আমাকে মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবি ভেবেছিস্?'

'মিথ্যে!' আকাশ থেকে পড়ল রাহাত। 'মানে?'

'মানে? মানে মিথ্যে হাট নাম্বার বলেছিস তুই আমাকে সেদিন। এই জন্যে তোকে খুঁজে বের করতে দশ মিনিট বেশি সময় লেগেছে, শিট্! চোদ্দ নাম্বার হাটের সেই ছুঁড়িকে কম্বল দিয়েছিস তুই। ভেবেছিস কেউ জানবে না, কেমন? কে হয় তোর ওই মাগী?'

শ্রাগ করল ও আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। বুঝে ফেলেছে খেলা শেষ। 'হ্যাঁ, ফ্রয়লাইন। সেদিন প্রথম আপনাকে দেখেছি তো, ভয়ে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল নাম্বারটা।' আড়চোখে দু'জনের মাঝের ব্যবধান দেখে নিয়ে কোট খুলল। 'কিন্তু কম্বল...কম্বল আমি পাব কোথায়? তাছাড়া...'

মাত্র তিন হাত দূরে আছে লিনয, ওয়ালথার চার হাত দূরে। সময়মত যদি হারামজাদীর হাতের নার্ভ সেন্টারে মারা যায়, যদি... ইউনিফর্ম টপস্ খোলার ফাঁকে সন্তর্পণে এক পা এগোল। 'বিশ্বাস করুন, ফ্রয়লাইন...'

বিদ্যুৎ খেলে গেল রাহাতের ডান হাতে। টপ্‌স মাথার ওপর দিয়ে গলাবার জন্যে দু'হাতই তুলেছিল ওপরে, ঝপ্ করে নেমে এল ওটা। একই মুহূর্তে কিছু সন্দেহ করলেও যেন মেয়েটা পিছিয়ে যেতে না পারে, সে জন্যে তার বাঁ পা মাড়িয়ে ধরল ও। কনুইয়ের ভেতরের অংশে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ খেয়ে গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা, ভালমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওয়ালথার হারাল। রাহাতের বাঁ হাত ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে। মাত্র সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ঘটে গেল এত কিছু, চেহারায় বিস্ময় ফোটানোর মত সময়ও পেল না লিনয। পেল পরিস্থিতির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ খুইয়ে।

চোখের আর মনের ধাঁধা কাটাল সে মাথা ঝাঁকিয়ে, বড় দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস। কয়েক মুহূর্ত লাগল ধাক্কা

কাটিয়ে উঠতে, চাউনিতে প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটল। মনে হলো এখনই চেঁচিয়ে উঠবে বুঝি।

ওয়ালথার নাচাল রাহাত। 'একটু ট্যাঁ-টোঁ করে দেখো, ফ্রয়লাইন, তোমার মগজ আর রক্তে এই ঘরের দেয়ালের রঙ পাল্টে দেব আমি।'

অসহ্য রাগে-ঘৃণায় থোক্ করে একদলা থুতু ছুঁড়ল লিনয ওকে লক্ষ্য করে, কিন্তু মিস করল। 'তুমি জানো তুমি শেষ, জুডেন শিট্?' বিষাক্ত সাপের মত হিসিয়ে উঠল। 'নিজেকে খুব বাহাদুর মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চই!' মুচকে হাসল ও। 'এটা যতক্ষণ হাতে ছিল, ততক্ষণ তুমিও নিজেকে তাই ভাবছিলে, তাই না? তো আমি কেন ভাবব না?'

দু'চোখ জ্বলে উঠল তার নিজের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে। 'এখনও নিজের পায়ে খাড়া আছ বলে ভেবো না জিতে গিয়েছ তুমি, শিট্! দরজার বাইরে এক পা রেখেই দেখো কি হয়।'

'দেখব, আগে তোমাকে শেষ করে,' শান্ত গলায় বলল ও। 'এতদিন কথায় কথায় পাখির মত মানুষ মেরেছ, লিনয। আজ তোমাকে মরতে হবে। সেদিন যখন অসুস্থ আনাকে আমার সামনে চড় মারলে, তখনই তোমাকে খুন করব প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

চেহারার কঠোর ভাব বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল লিনযের। নরম হলো চাউনি। একেবারে অন্যরকম হয়ে গেল। লজ্জা পেয়ে বুক ঢাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু শুধু হাত দিয়ে সব ঢাকার উপায় নেই বুঝতে পেরে চট্ করে খাটে বসে কম্বল টেনে দিল গায়ের ওপর।

একেবারে শান্ত গলায় বলল, 'দেখো, তুমি যা খুশি করতে পারো আমাকে নিয়ে। কাউকে কিচ্ছু বলব না আমি। কাউকে বলব না।'

'আচ্ছা!' না হেসে পারল না ও। 'তুমি ভেবেছ তোমার

শুয়োরের চেয়েও নোংরা শরীরের লোভ দেখিয়ে তুমি আমাকে...' মাথা দুলিয়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল। 'তুমি জানো তুমি কত জঘন্য নোংরা এক কীট? কুকুরের চাইতেও অধম তুমি? একটা বেশ্যার মানসিকতাও তোমার চেয়ে অনেক ভাল, সঙ্গী বাছাইয়ের বেলায় সে-ও মাঝেমধ্যে রুচির পরিচয় দেয়। তোমার সেই বোধটাও যে নেই, তা বোঝো?'

এত সমস্ত অসহ্য মন্তব্য অসহায়ের মত বসে বসে শুনতে হচ্ছে বলে রাগে দিশেহারা হয়ে উঠল ইরমা লিনয। তবু সামলে নিল উপায় নেই দেখে। 'না, সত্যি...মানে, আমি অতসব চিন্তা করে বলিনি কথাটা। আর...তুমি জানো গুলির শব্দ হলে কি ঘটবে। সঙ্গে সঙ্গে...'

'আমি জানি কি ঘটবে, কিন্তু তা দেখার জন্যে তুমি তখন থাকবে না, ফ্রয়লাইন।' ওয়ালথার নাচাল রাহাত। 'শুয়ে পড়ো।'

'কি!'

'শুয়ে পড়ো।'

অনিশ্চিত, লজ্জা পাওয়া হাসি ফুটল তার মুখে। 'কেন?'

মেজাজ বিগড়ে গেল রাহাতের। খেঁকিয়ে উঠল, 'শুয়ে পড় নাজি কুত্তী! এক লাথি মেরে চেহারা ভর্তা করে দেব তোর!'

ভয়ে ভয়ে নির্দেশ পালন করল ওবেরস্টার্মফিউরার। করুণ দৃষ্টি ওর মুখের ওপর স্থির। 'প্লীজ, মেরো না আমাকে।'

'উপুড় হয়ে শোও।'

'সত্যি মারবে না তো?' বলেই আঁতকে উঠল ওকে দাঁত খিঁচিয়ে এগোতে দেখে। 'আচ্ছা আচ্ছা, শুচ্ছি।' যথেষ্ট সময় নিয়ে ঘুরে শুলো সে, বালিশে মুখ গুঁজল। অজানা আশঙ্কায় পিঠের পেশী শক্ত হয়ে আছে। বিশাল দুই নিতম্ব চক্‌চক্ করছে ল্যাম্পের আলোয়। খাট নড়ে উঠতে গালের পেশী কুঁচকে উঠল ভয়ে। লোকটা কি করছে দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু সাহস হয় না।

ততক্ষণে করণীয় ঠিক করে ফেলেছে রাহাত। সোজা ব্যাপার, হয় লিনযকে মরতে হবে, নয়তো ওকে। এর কোন বিকল্প নেই। তবে প্রমাণ রাখা চলবে না। কাজটা এমন ভাবে সারতে হবে যাতে সহজে কেউ টের না পায়।

তার মেরুদণ্ডের গোড়ায় ডান হাঁটুর ভর চাপিয়ে দিল ও যাতে নড়তে না পারে মেয়েটা, বাঁ হাত রাখল বাঁ কাঁধে। তারপর ওয়ালথার উল্টো করে ধরে মাথার পিছনে যেখানে সবচেয়ে বেশি চুল, ধাঁই করে সেখানটায় মেরে বসল। পাশবিক গোঙানি বেরিয়ে এল লিনযের গলা দিয়ে। মেরুদণ্ড ধনুকের মত বাঁকা করে মাথা তুলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল হঠাৎ। স্থির হয়ে গেল। মারের জায়গাটা দেখে সন্তুষ্ট হলো রাহাত। চুল আড়াল করে রেখেছে, সহজে কারও চোখে পড়বে না।

নেমে পড়ল খাট থেকে। পিস্তল কোমরে গুঁজে অনেক ধস্তাধস্তি করে চিত করল উলঙ্গ দেহটা, কম্বল দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে দিল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে লিনযের, দম নিচ্ছে লম্বা করে। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। মাছের ক্যানে চোখ বোলাল রাহাত। টম্যাটো-গন্ধী থক্‌থকে তেলের মধ্যে আটটা আস্ত হেরিং মাছ ভাসছে। ওর দুটো তুলে নিল, অন্যহাতে হাঁ করিয়ে ওর গলার মধ্যে ভরে দিল একসঙ্গে। জোরে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল যতদূর যায়। মাথা নড়ে উঠল মেয়েটার, তবে জ্ঞান ফেরেনি, রিফ্লেক্স অ্যাকশন।

আরও দুটো মাছ গুঁজে দিল রাহাত। মুখের চারপাশে তেল-ঝোল মেখে বিদঘুটে হয়ে উঠল তার চেহারা। যদি পোস্ট মর্টেম করানো হয়, গলার ভেতরের ছেঁড়া-কাটা দেখেই যা বোঝার বুঝে ফেলবে ডাক্তার। তবে মেজর গ্রজ সে ঝামেলায় যাবে বলে রাহাতের মনে হলো না।

কারণ এমনিতে সে লিনযকে পছন্দ করে না, তারওপর এর রাক্ষুসে খাওয়া সম্পর্কে ভালই ধারণা আছে। নিশ্চই ধরে নেবে

একবারে বেশি বেশি খেতে গিয়ে গলায় আটকে মরেছে। তাই ওসব করতে যাবে না।

হঠাৎ ঘড়ঘড়ানি থেমে গেল লেফটেন্যান্টের, দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল চোখমুখ। অল্প অল্প ঘামও ফুটল কপালে। গালেট পুরো রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় দম নিতে পারছে না। আচমকা পুরো চোখ মেলে তাকাল সে, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রাহাতকে দেখল। পরমুহূর্তে ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পেটের ওপর বসে দু'হাতে ঠেসে ধরে রাখল ও।

ছট্‌ফট্‌ করতে শুরু করল লিনয। বিস্ফারিত চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বের হয়ে আসার অবস্থা। ভয়াবহ গোঁ গোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে গলা দিয়ে। আরেকবার ওঠার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মেজর অনড়। গলা মনের পুরোটা দখল করে বসেছে, এখন তাই ওকে দেখেও দেখছে না লিনয। দুর্বল হয়ে পড়ল একটু একটু করে, ছট্‌ফটানির তেজ কমে আসছে।

নব্বই সেকেন্ডের মাথায় পুরো নিস্তেজ হয়ে গেল সে, নেতিয়ে পড়ল। সড়সড় করে আধ হাত বেরিয়ে এল জিভ, দ্রুত রঙ বদলে কালো হয়ে গেল। একসময় পুরো স্থির হয়ে গেল দেহটা।

শেষ পর্যন্ত ও যা ভেবেছিল, তাই ঘটল। পরদিন দুপুরে লিনযের মৃত্যুর খবর জানাজানি হওয়ামাত্র গ্রজ চাপা দিয়ে দিল গোটা ব্যাপার। তার এক অফিসার বেশি খেতে গিয়ে মরেই গেছে, ফাঁস হতে দিতে চায় না সে। বিনা পোস্ট মর্টেমে হামবুর্গে, তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো লাশ।

কিন্তু লিনযের মৃত্যুর খবর ফাঁস হওয়ার আগে আরেক খবর স্তম্ভিত করে দিল মেজর রাহাতকে। মারাত্মক আঘাত হয়ে দেখা দিল খবরটা।

কেন জানে না ও, মরার দিন হাট চোদ্দর সমস্ত বন্দীকে রাত একটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার শাস্তি

ঘোষণা করে রেখেছিল সে। ট্রুপাররা তাই করেছে। রাতভর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে আনা। ভোরে সেই যে বিছানা নিল মেয়েটা, চিরজীবনের জন্যে নিল। সেদিন ছিল ২৮ ডিসেম্বর।

যোগাযোগ করার কোন উপায় ছিল না রাহাতের। কারণ লিনযের মৃত্যুর জন্যে অনির্দিষ্ট কালের কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছিল মেয়েদের অংশে।

নয়

৩০ ডিসেম্বর, সোমবার। ওয়ারশ।

গেস্টাপো চীফ স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যানের অফিসে একজনই ঢুকতে পারে তার অনুপস্থিতিতে, সে তার অর্ডারলি। ওইদিন কাজে যোগ দিল লোকটা, নির্দেশমত আন্টারস্টার্মফিউরার হেল্ডের ডেস্ক থেকে মেজরের জন্যে বাছাই করে রাখা সমস্ত ফাইল, একটা বড় লিস্ট আর একটা চিঠি নিয়ে এল। অপেক্ষায় থাকল মেজরের।

পোলিশ অ্যাসিসট্যান্ট চীফ অভ দ্য কালেকশন অ্যান্ড রেকর্ড অফিস থেকে বাছাই হয়ে এসেছে ওগুলো। নিয়ম হলো গ্রেফতারকৃতদের প্রত্যেকের নামে একটা করে ফাইল তৈরি করবে পোলিশরা, ক্যাটাগরি অনুযায়ী। গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সে এক চক্কর দিয়ে ফের ওদের কাছে ফেরত যাবে সব, আবার আসবে বন্দীদের মধ্যে বিশেষ যারা আছে; যদি কেউ থাকে, তাদের

অতীত রেকর্ডসহ। ফাইলের বোঝার সাথে আলাদা এক তালিকায় থাকে সে সব।

অফিস আওয়ার শেষ হতে সবকিছু সবুজ এক সেফে তুলে রাখল অর্ডারলি। আসেননি মেজর। আসার কথাও ছিল না আজ। তবু যদি আচমকা এসেই পড়েন, তাই অপেক্ষায় থাকা আর কি! কাল আবার ওগুলো বের করবে সে, না এলে ফের পরেরদিন। ওইদিন, বুধবার, অবশ্যই আসবেন তিনি। কথা আছে।

এই দফায় যে সব ফাইল মেজরের জন্যে অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে একটা আছে সবার থেকে আলাদা। টকটকে লাল রঙের ওটা। ওপরে বড় করে বন্দীর নাম লেখা: জেরি লুবানস্কি।

অশউইৎজ।

আবহাওয়া ভীষণ খারাপ। এতই খারাপ যে কোমান্ড্যান্ট গ্রজ রুটিন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। ভোর হতে না হতে পাইকারী গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না গত দু'দিন থেকে।

প্রচণ্ড তুষারপাতে সব অন্ধকার। হাঁটাচলার পথ পরিষ্কার রাখতেই জান খারাপ বন্দীদের। পিট পরিষ্কার রাখতে ব্যস্ত রয়েছে একদল সাধারণ কয়েদী, আবহাওয়া একটু ভাল হলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেয়া যায় কাজ। সন্ডারকোমান্ডোরা অন্য কাজে ব্যস্ত। প্রায় বিনা কষ্টের কাজ।

দু'সপ্তাহ ধরে জমে ওঠা মৃতদের সম্পদের মধ্যে দামী দামী যা কিছু আছে, সব আলাদা করে গোছাচ্ছে তারা। সব বার্লিন যাবে, ওখানে সেসবের কি ব্যবস্থা হবে, থার্ড রাইখের যারা মাথা, তারা জানে। দুই নাম্বার ক্রিমেটোরিয়ামের বিশাল হলে চলছে বাছাই কাজ।

কয়েক জায়গায় পাহাড়ের মত স্তূপ করে রাখা আছে সে সব। হীরে-মুক্তোসহ দামী পাথরের শ শ আংটি, গলার চেইন-হার,

কানের দুল, হাতঘড়ি, সোনার নকল দাঁত, আরও কত কি! দেখলে মাথা ঘুরে ওঠে।

রোজ এখানে কি হারে মানুষ মরে, গত ক'দিন চোখে দেখেও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেনি রাহাত। আজ বুঝল। নীরবে কাজ করে যেতে লাগল কযিনস্কির সাথে। মন ভাল নেই। মেয়েদের ক্যাম্পে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে আনা কাইবাল্টনা, অথচ ও কিছু করতে পারছে না। কিচ্ছু না। লিনয মারা যাওয়ার পর কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে মেয়ে ক্যাম্পে। কারও যাওয়ার উপায় নেই ওখানে। এদিকে ক্যাম্পে কানাঘুষা চলছে, অল্প সময়ে, একসঙ্গে আরও বেশি বেশি বন্দী কি করে মারা যায়, মেজর গ্রজ তাই নিয়ে মাথা খাটাচ্ছে।

রোজ শ শ বন্দী মরছে। গুলিতে, না খেয়ে, শীতে, অসুখে এবং আরও নানাভাবে। তারপরও মেজরের মন ভরছে না, বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে। ওর ভেতরে মন বলে কিছু আছে কি না, কলজেটা ইস্পাতের তৈরি কি না, বুকটা ফেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে রাহাতের একেক সময়। ওর নিজের যে নাম্বার, তাতে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে বন্দীর সংখ্যা এতদিনে দু'লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

বেশিরভাগই পোলিশ ইহুদী। কিছু জার্মান, কিছু ফরাসীও আছে। এই দলের পরিচয় হলুদ ব্যাজ। রাহাতেরও তাই। রাজনৈতিক বন্দী যারা, তাদের ব্যাজ টক্‌টকে লাল। এরা সবচেয়ে দুর্ভাগা। এক-আধজন ইহুদীরও নাজি বাহিনীর করুণার ফাঁক-ফোকর গলে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু ওদের নেই। অশউইৎজে সবচেয়ে আগে মরে ওরা।

অন্য যে সমস্ত ক্যাটাগরি আছে, তার একদল কাপো ও সাধারণ অর্ডারলি। ওরা পরে সবুজ ব্যাজ। ওটা সাধারণ পেশাদার অপরাধীর পরিচিতি। চোর-ডাকাত, খুনী, সব আছে ওই গ্রুপে।

অথচ ওরাই সবচেয়ে ভাল আছে অশউইৎজে। সাধারণ বন্দীদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরায়, ভাল খায়।

আর আছে ইহুদী ধর্মযাজক—রাবাই। হালকা লাল ব্যাজ এদের। চিহ্নিত সমকামীদের গোলাপী, বেশ্যাদের কালো।

এ মুহূর্তে খুব বেশি হলে ত্রিশ হাজার বন্দী আছে, ভাবছে রাহাত। তার মানে দু'লাখের এক লাখ আশি হাজারই মরেছে! অথচ এই ক্যাম্পের বয়স এক বছরও পুরো হয়নি এখন পর্যন্ত। তার মানে রোজ গড়ে প্রায় পাঁচশো! তাও তো আসার পথে যারা মারা যায়, তাদের হিসেবে ধরা হয় না।

ভাবতে গিয়ে অজান্তে হাত থেমে গিয়েছিল ওর, এক ট্রুপারের দাবড়ি খেয়ে সচকিত হলো। তাড়াতাড়ি মন দিল কাজে। সোনার দাঁত বাছাই করছে ও। দেহ পুরো ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া একদল এসএস মৃতের মুখ থেকে বের করে নেয় ওগুলো। রাহাতের পিছনে চশমার স্তূপে কাজ করছে কয়েক সন্ডারকোমান্ডো। সোনার ফ্রেমেরগুলো আলাদা করছে।

হলের এক কোনায় জুতো, বুট আর নকল হাত-পায়ের বিশাল পাহাড়। ওটার কাছে রয়েছে আরেকটা, প্যারাম্বুলেটরের। কোলের শিশুদেরও যে এখানে রেহাই মেলে না, ওগুলো তার নীরব সাক্ষী। ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখা আছে ওগুলো, প্রতিটার পিছনের ক্যারিয়ার থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা করে ফীডার।

রাহাতের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কেশে উঠল কযিনস্কি। 'ওই যে সমস্ত জুয়েলারি দেখছ, ওগুলো আলাদা কেন রাখা হয়েছে জানো?' বলল সে।

'কেন?'

'প্যাক করার আগে ওয়াশ করতে হবে, তাই।'

'ওয়াশ করতে হবে!'

'হ্যাঁ। ওগুলো মেয়েদের ইসের মধ্যে ছিল,' দাঁত বের করে

হাসল লোকটা। 'বেকুব আর কাকে বলে! ভেবেছে ওখানে লুকিয়ে রাখলে কেউ টের পাবে না। বেশ মজাই হয়েছে, বুঝলে? ইচ্ছেমত সার্চ করা গেছে।'

নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল কযিনস্কি।

দুপুরে খেয়ে আবার কাজে লাগল মেজর রাহাত। কাপো গেছে অন্য কাজে, তার জায়গায় তাদুয়েস ম্যান এসেছে। আগের দফায় ওকে আর কযিনস্কিকে গল্প করতে দেখে কিছু একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে লোকটার মনে। তার চাপা ডাক শুনে মুখ তুলল রাহাত। চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে তাকাল।

'আমার মনে হয় তুমি পালাবার প্ল্যান করছ,' বলল ম্যান।

'কেন এমন মনে হলো?'

হাতের কাজ ফেলে ওর দিকে ঘুরে বসল ছোটখাট পোল। 'আমি বুঝি, ব্রাদার। প্রথম যখন তোমাকে দেখলাম, এই ইউনিফর্মে, তখনই বুঝে ফেলেছি এমন কিছু একটা ঘটাবে বলে ঢুকেছ তুমি এখানে। ঠিক বলিনি?'

'জেনেই যদি থাকো, কেন তাহলে জিজ্ঞেস করছ?' বিরক্তি চেপে রাখার চেষ্টা করল না ও।

'কারণ আমি শিওর হতে চাই।'

'কেন?'

'আমিও যেতে চাই তোমার সাথে।'

মোটেও অবাক হলো না ও, বরং আরও আগেই কেন ইচ্ছেটা সে প্রকাশ করেনি, তাই ভাবল। 'এতই যখন জানো, কোমান্ড্যান্টকে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলে নিজের ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেই তো পারো। আমার সাথে যাওয়ার কি দরকার?'

চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'ওদের আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি,

কোনকিছুতেই ওদের সাহায্য নিতে চাই না। তোমাকে বিট্রে করতেও চাই না। শেষ ব্যাচের আসা বন্দীদের একজন আমাদের পাড়ার। সে বলেছে, আমার মার ক্যান্সার ধরা পড়েছে শেষ সময়ে। বেশিদিন বাঁচবে না মা, তাই...'

তীক্ষ্ণধার ছুরির মত এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে ঢুকতে দরজার দিকে তাকাল ওরা একযোগে। নতুন একদল সন্ডারকোমান্ডো ঢুকেছে। 'যদি বলি তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয়? যদি বলি তোমাকে নেয়া সম্ভব নয়? যদি...' লোকটাকে কাঁদতে দেখে থেমে গেল রাহাত। অস্বস্তিতে পড়ে গেল।

'আমি অবিশ্বাস করব না। আমি জানি তুমি মিথ্যে কথা বলার মানুষ নও।'

একটু নরম হলো ও। 'কি করে জানলে?'

জবাব দিল না তাদুয়েস ম্যান। রাহাত সমস্যায় পড়ে গেল। ওর প্ল্যান প্রায় পাকা, যে কোনদিন পালাবে, এমন সময় এই উটকো ঝামেলা হাজির। কি করবে এখন ও? লোকটা বলছে যদিও কাউকে কিছু জানাবে না, কিন্তু ও তা ভুলেও বিশ্বাস করতে রাজি নয়। যদি ভরসা না দেয়া হয়, অবশ্যই মুখ খুলবে ব্যাটা। কিন্তু এ কথা কি করে টের পেল সে, কিছুতেই মাথায় এল না।

'ঠিক আছে। সঙ্গীর সাথে কথা বলতে দাও, তারপর দেখি কি করা যায় তোমার ব্যাপারে। কাল-পরশু জানাব তোমাকে।'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল পোলিশের শুকনো মুখে। ইউনিফর্মের আস্তিনে চোখের পানি মুছল সে। 'আমি জানি কে তোমার সঙ্গী।'

শীতল, স্থির চোখে তাকে দেখল মেজর। একইরকম গলায় বলল, 'মনে রেখো, এ ব্যাপারে মুখ দিয়ে একটা বেফাঁস কথাও যদি বের হয়েছে, আমার আগে তুমি মরবে।'

ওর চাউনি দেখে কলজের ভিত্ নড়ে গেল ম্যানের। অপ্রস্তুতের মত হাসল ফ্যাকাসে চেহারায়। 'না না, কাকে বলব?' বিড়বিড়

করে বলল। 'কেন বলব? বললে তো আমারই...'

আনা কাইবাল্টনা মরে যাচ্ছে। প্রাণটা আটকে আছে ঠোঁটের ডগায় এসে, বেরিয়ে যাবে যে কোন সময়। এ মুহূর্তে কেউ নেই ওকে সাহায্য করার। কারণ জানের মায়া সবারই আছে। ক্যাম্পের ডাক্তার অবস্থা দেখে ওর বেড ক্যান্সেল করে দিয়ে গেছে। তারপরই চ্যাঙদোলা করে বেড থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে মেঝেতে। এ সময়ে ওকে যে সাহায্য করতে যাবে, সেই বিপদে পড়বে।

মেঝেতে পেশাবের জমাট বাঁধা হিম সাগরে নেতিয়ে পড়ে আছে ও, গায়ে একটা কম্বল আছে বটে, তবে ওটা থাকা না থাকা দুইই সমান এখন। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, জগতের মায়া ছেড়ে যেতে ব্যস্ত দু'চোখের ঘোলাটে নজর স্থির হয়ে থাকে হাটের দরজার ওপর। খোঁজে কি যেন। একটা মুখ খোঁজে আনার অবচেতন মন—সে মুখ মেজর রাহাতের।

যদিও জানে ও মুখের দেখা আর কোনদিন পাবে না, তবু, জ্ঞান যখনই ফেরে, নজর দরজার দিকে ঘুরে যায় আপনাআপনি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ তাকিয়ে থাকে, একনাগাড়ে দরদর করে পানি গড়ায় চোখ দিয়ে। মোছার শক্তি নেই, তাই ঠিকমত দেখতে পায় না। তাই বলে চোখ ফেরাবার মত বোকামি আনা করে না।

কে জানে, যদি আসে মেজর! যদি ওকে খোঁজে! যদি বেডে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়!

৩০ ডিসেম্বর গভীর রাতে নীরবে চিরবিদায় নিল আনা কাইবাল্টনা। ভাগ্যই বলতে হবে, শেষ মুহূর্তে দেখা হয়ে গেল তার মেজরের সাথে।

নিজের হাতে ওকে পিটে নিয়ে ফেলেছে রাহাত।

*

পরদিন দুপুরে খেতে বসেছে সন্ডারকোমান্ডোরা, এই সময় দমকা ঝড়ের মত এসে হাজির এক স্কোয়াড এসএস। এক তরুণ আন্টারস্টার্মফিউরার নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের। হাতে ওয়ালথার। থতমত খেয়ে গেল সবাই, তাদের বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়ে প্রকাণ্ডদেহী কাপো, কযিনস্কিকে ধরে নিয়ে গেল ওরা। কেউ একটু নড়লও না।

দু'মিনিটের মধ্যে ঘন তুষারের আড়ালে উধাও হয়ে গেল এসএস স্কোয়াড। এর কি অর্থ? পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন করল সবাই। খাওয়া মাথায় উঠে গেছে। এইভাবে বিনা নোটিসে যদি একজন ব্লক লীডারকে ধরে নিয়ে যেতে পারে ওরা, তাহলে অন্যদের বেলায় কি না করতে পারে?

বিকেল হলো, খবর নেই কযিনস্কির। কোথায় আছে সে, কেউ জানে না। চারদিকে গুজগুজ, ফুসফুস চলছে। মানুষটার ভাগ্যে কি ঘটেছে, তাই নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। রাহাত নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। গভীর চিন্তায় মগ্ন। তাদুয়েস ম্যাঁনের গলা শুনে ধ্যান ভাঙল ওর একসময়।

'নিশ্চই ও পালাবার প্ল্যান করেছিল,' নার্ভাস গলায় বলল সে। 'কেউ হয়তো শুনে ফেলেছে। বেচারা!'

কিছু বলল না রাহাত। তাকালও না তার দিকে। ঘন ভুরুর কুঞ্চন আরও একটু বাড়ল কেবল। অনেক আগেই বুঝেছে ও কেন কি ঘটেছে।

'এমনটা তো হতেই পারে,' জোর দিয়ে বলল পোলিশ। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'কি বলো, ব্রাদার, পারে না?'

রাগে গা জ্বলছে। গত ক'দিন রাহাত আর কযিনস্কি একসাথে কাজ করেছে, কথাবার্তাও বলেছে কাজের ফাঁকে, আর তাই দেখেই সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে হারামজাদা। ফাঁস করে

দিয়েছে খবর। পরম সৌভাগ্য যে লুবানস্কির সাথে কাজ করেনি রাহাত। তাহলে হয়তো এতক্ষণে…।

আনার মৃত্যুতে এমনিতেই মন ভাল নেই, তার মধ্যে লোকটার এই বিশ্বাসঘাতকতার পরও ভালমানুষের ভান অসহ্য লেগে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল ওর, ভান করছে না আর ম্যান।

'কযিনস্কি শেষ,' ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল। 'এখন তো আমাকে সঙ্গে নিতে কোন আপত্তি নেই তোমার, ব্রাদার?'

'না,' আরেক দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল রাহাত। 'নেই।'

আনন্দে চকচক করে উঠল ম্যানের দু'চোখ। আবেগে মুহূর্তের জন্যে ওর হাত চেপে ধরল শক্ত করে। 'ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। সত্যি, আমার এখান থেকে বের হওয়া খুব জরুরী। সেই জন্যেই… মানে…'

'আমি বুঝি,' শূন্য, দূরাগত দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল ও। 'ব্যাখ্যা করতে হবে না তোমাকে।'

চেহারা হেসে উঠল তার। 'আমি জানতাম, আমি জানতাম।'

অশউইৎজ এমনই এক জায়গা, যেখানে অমুক পালাতে চাইছে, মুখ দিয়ে কেবল এইটুকু খালাস করলেই মামলা খতম, আর কিছুর দরকার হয় না। অভিযোগ সত্যি কি মিথ্যে, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না জার্মানরা। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এই জাতীয় কথা উঠলে তক্ষুণি তার গোড়া মেরে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবে।

সন্ধের সময় কাজ থেকে এসে সবাই দেখল কযিনস্কি ফিরেছে। হাটের সামনে নিজের ব্লক সদস্যদের ফেরার অপেক্ষায় মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

পাথরের মূর্তির মত অনড়। হাটের দেয়ালে পিঠ দিয়ে রয়েছে সে। পরনে হেসিয়ান কাপড়ের স্ট্রাইপড্ ইউনিফর্ম ছাড়া কিছু নেই। পেশীবহুল দু'হাত কাঁধ বরাবর উঁচুতে টান টান হয়ে আছে, কাঠের দেয়ালের সাথে লম্বা বেয়োনেট দিয়ে দুই কব্জি গাঁথা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে আছে সামান্য।

বেয়োনেটের ফুটোয়, নাকেমুখে চাক চাক রক্ত। মাথায়, কাঁধে উঁচু হয়ে বরফ জমে আছে। চোখ খোলা—মাটির দিকে তাকিয়ে আছে কযিনস্কি। জমে শক্ত হয়ে গেছে।

ইচ্ছে থাকলেও একবারের বেশি সেদিকে তাকাতে সাহস হলো না কারও। কে আবার কার আচরণে সমবেদনা দেখতে পায়, সুবিধে পাওয়ার আশায় গিয়ে উগরে দিয়ে আসে, কে বলতে পারে?

'সাফল্য দেখে গর্ব হচ্ছে না?' নিচু গলায় ম্যানকে প্রশ্ন করল রাহাত।

ছোট কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল সে। 'এখানে এলে কেউ বাঁচে না, ব্রাদার। সব্বাইকে মরতে হয়। ও দু'দিন আগে মরেছে, এই যা।'

মেয়ে ক্যাম্পের কারফিউ তুলে নেয়া হলো সেদিন দুপুরে। ট্রুপারদের কড়াকড়ি একটু শিথিলও হয়েছে দেখা গেল। অতএব আর নয় এ নরকে। কালই পালাবে ঠিক করে ফেলল রাহাত। রাতে সে খবর জানিয়ে দিল লুবানস্কিকে।

১ জানুয়ারি, ১৯৪১।

নিউ ইয়ারস ডে উদযাপনের জন্যে ভোর চারটায় মর্নিং কলে দাঁড়াতে হলো বন্দীদের। অকল্পনীয় শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে জার্মান জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হলো—তারপর থার্ড রাইখের দ্বিতীয় জাতীয় সঙ্গীত, 'হর্স্ট ওয়েসেল সং'।

এক সময় গান শেষ হলো, এরপর রোল কল। আজ বেশ দেরি করে বের হলো মেজর গ্রজ, সাতটায় এল মাঠে। কল অনেক আগে শেষ হলেও তার দেরির কারণে মুক্তি পেল না কেউ। আটাশজন বন্দী কম হলো আজ, রাতে মারা গেছে তারা। তার একজন তাদুয়েস ম্যান।

রাতে বাথরুমের স্টীলের বেসিনের ওপর পা পিছলে পড়ে হাতের রগ কেটে ফেলেছিল সে, কোনমতেই রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

অশউইৎজে যখন জীবন-মৃত্যুর নৈমিত্তিক খেলা শুরু হলো, একশো ষাট মাইল উত্তর-পুবের ওয়ারশয় তখন ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ উঁকি দিল। খুব অল্প সময়ের জন্যে অবশ্য।

ঘড়ির কাঁটা ধরে গেস্টাপো হেডকোয়ার্টার্সের তালা খুলল, কাজকর্ম শুরু হলো। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা, সাথে কিছুটা উদ্বেগও আছে। কারণ সপ্তাহখানেকের ছুটি কাটিয়ে আজই কাজে যোগ দেয়ার কথা স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যানের।

ঠিক আটটার সময় পৌঁছল সে। অর্ডারলি সসম্মানে অফিস খুলে দিতে মার্চ করে ভেতরে ঢুকল। সব সময় যেমন থাকে, আজও তেমনি স্মোকড সানগ্লাসে চোখ ঢাকা তার। চেয়ারের কাছের ক্লোক স্ট্যান্ডে তার গ্রেটকোট যত্নের সাথে ঝুলিয়ে রাখল অর্ডারলি। ক্যাপ সে নিজেই রাখল ডেস্কের ওপর। কালো গ্লাভস খুলল না।

এক কাপ ধূমায়িত কড়া, কালো কফি ডেস্কে রেখে স্যালুট করে বেরিয়ে গেল অর্ডারলি লোকটা। আর সবার মত সেও যমের মত ভয় করে মেজরকে। জানে, যতক্ষণ তার থেকে দূরে সরে থাকা যায়, ততই ভাল।

রুমের চারদিকে চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হলো মেজর। পকেট

থেকে সিলকের রুমাল বের করে নাকের ডগা মুছল, কাশল খুক্ করে। কফিতে চুমুক দিল, চোখ পড়ে আছে ব্লটারে চাপা দেয়া খামটার ওপর। ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা দেখে একটু কৌতূহল ফুটল চেহারায়। ওদিকে হাত বাড়াবার আগে কফি শেষ করল মেজর, হেল্ডের তৈরি সামারি রিপোর্টটায় চোখ বোলাল। সবশেষে ফাইলের স্তূপের ওপর।

মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। তার কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছে ছোকরা, প্রায় দুইশো ফাইলই গায়েব। গুট্, ভাবল মেজর, কলজেতে ভালমত ভয়ের ছ্যাঁকা খেলে তবেই কাজ ভাল করে ব্যাটারা। দ্রুত ফাইলের তালিকায় চোখ বোলাল মেজর, মাত্র একটা নামই দৃষ্টি আকর্ষণ করল—জেরি লুবানস্কি।

কয়েক মুহূর্ত ভাবল নিউম্যান। চেনা নাম। একেই খুঁজছিল সে মনে মনে। লাল রঙের ফাইল খুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দু'বার পড়ল সে পুরোটা, তারপর আরেক কাপ কফির জন্যে হাঁক ছেড়ে বসে থাকল চুপ করে। অর্ডারলি ঢুকতে বাকি সমস্ত ফাইল সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল।

কফি পানের ফাঁকে আরেকবার লুবানস্কির ফাইল পড়ল মেজর। চেহারা দেখে বোঝা যায় খুশি। সে জানে তার চীফ, হেইনরিখ হিমলারের গোপন তালিকায় এই নামটা আছে। জেরি লুবানস্কির ব্যাপারে গেস্টাপো এবং এসডি বা সিশেরহেইস্টডিয়েনস্ট (সিকিউরিটি সার্ভিস), দুই সংস্থাই সমান আগ্রহী।

একে যদি বার্লিনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে নিউম্যান, তাহলে…ভাবতে গিয়ে নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে উঠল। বছরের প্রথম দিনেই এমন এক দারুণ সুখবর পাওয়া গেল, ভাবতে বেশ দারুণ লাগছে। বোঝা যাচ্ছে পুরো বছরটাই ভাল কাটবে। আপন চিন্তায় বুঁদ হয়ে বসে থাকল সে, গাল ভরা হাসি।

নিজেকে ফিরে পেতে একটু সময় লাগল স্টার্মব্যানফিউরারের।

খামটা খুলে ভেতরে যা আছে বের করল। একটা পাতলা কাগজের শীট, ছোট ছোট অক্ষরে কি সব হিজিবিজি লেখা। অর্ডারলিকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আনতে বলে অপেক্ষা করতে লাগল সে। বুঝে ফেলেছে হাতে ধরা ওটা একটা কোডেড বার্তা। নিশ্চই কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর হবে।

পাঁচ মিনিট পর থমথমে চেহারায় বসে থাকতে দেখা গেল নিউম্যানকে। ওটা কোডেড মেসেজই, এসেছে লন্ডন থেকে। পাঠিয়েছে লন্ডনের এক বার মালিক। জার্মান এজেন্ট।

'স্ট্রাইক ফোর্স!' বিড়বিড় করে বলল নিউম্যান। 'মেজর রাহাত!! জেরি লুবানস্কিকে উদ্ধার করতে...?'

এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হলো সে। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েও শেষ মুহূর্তে থেমে গেল। অশউইৎজের কোমান্ড্যান্টকে সতর্ক করতে চাইছিল, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না বুঝে মত বদলেছে। তারা দু'জন একই র‍্যাঙ্কের, বিশেষ বনিবনা নেই। যদি তার কথায় গ্রজ কিছু সন্দেহ করে বসে, হয়তো নিউম্যানকে নিরাশ করে নিজেই মজা লুটতে চাইবে। তা সে হতে দিতে পারে না। আর কেউ তার কৃতিত্ব ছিনিয়ে নিক, কিছুতেই সহ্য হবে না তার।

বরং...ঘড়ি দেখল নিউম্যান। প্রায় নয়টা। এখনই যদি বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে, ঘণ্টা পাঁচেকের মধ্যে নিশ্চই পৌঁছে যেতে পারবে ক্যাম্পে। অবশ্য রাস্তা যদি বেশি খারাপ না থাকে। সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে। বিনা নোটিসে হাজির হয়ে আগে ইহুদীর বাচ্চাকে ধরবে নিউম্যান, তারপর...অর্ডারলির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল সে।

'পূল সার্ভিসকে এক্ষুণি আমার জন্যে গাড়ি আর শোফারের ব্যবস্থা করতে বলো।'

'রাইট, হের স্টার্মব্যানফিউরার। এসকর্ট...'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল সে। 'দরকার নেই।'

তীরবেগে দৌড়ে পালাল লোকটা। কোডেড চিঠি খামসহ পকেটে পুরে রাখল মেজর, গ্রেট কোট গায়ে চড়িয়ে হ্যাট চেপে বসাল মাথায়। পুরো রেডি হওয়ার আগেই ফিরল অর্ডারলি।

'গাড়ি রেডি?' লাল ফাইলটা তুলে নিয়ে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল নিউম্যান।

'ইয়েস, হের মেজর! স্যার, শোফার জানতে চাইছে রেজিস্টারে কোন জায়গার নাম লিখতে হবে।'

'অশউইৎজ!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলল সে।

এক মিনিট পর কালো রঙের প্রকাণ্ড এক মার্সিডিজ মেজরকে নিয়ে হুশ করে বেরিয়ে এল হেডকোয়ার্টার্স থেকে। যত দ্রুত সম্ভব দক্ষিণে ছুটল। ততক্ষণে আবার ধূসর মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ, যে কোন মুহূর্তে তুষারপাত শুরু হবে।

মেঘ এত নিচ দিয়ে ভাসছে, নিউম্যানের মনে হলো হাত বাড়ালেই বুঝি ধরা যাবে। দামী সিগারেট ধরিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে সে।

জায়গামত পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে, সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন। চিঠি অফিসে ঢুকেই কেন খোলেনি, সে জন্যে এখন আফসোস হচ্ছে। তাহলে এতক্ষণে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে থাকতে পারত।

দশ

১ জানুয়ারি। অশউইৎজ। আকাশ থমথমে। যে কোন মুহূর্তে ভারী

তুষারপাত শুরু হওয়ার লক্ষণ।

মেজর গ্রজের দাবড়ি খেয়ে কাজে লেগে পড়ল কাপো ও সন্ডারকোমান্ডোর দল। রাহাতের গ্রুপে কাজ করার জন্যে রাতের খাবার নিজের কাপোকে ঘুষ দিয়ে রেখেছিল বিজ্ঞানী, এদিকে কযিনস্কির জায়গায় রাহাতকে সাময়িকভাবে ওর গ্রুপের কাপো নিয়োগ করা হয়েছে। কাজেই দু'জনের কাছাকাছি হতে কোন সমস্যা হলো না।

ম্যানের জায়গায় জুটি হিসেবে জেরি লুবানস্কিকে ডেকে নিল রাহাত। দুপুর পর্যন্ত একটানা লাশ টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'জনে। কিন্তু পাত্তা দিল না কেউ। সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠছে ভেতরে ভেতরে। আনার মারা যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে চেয়েছে লুবানস্কি, রাহাত তাতে যোগ দেয়নি। অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে চায় ও।

মৃত্যু নয়, জীবন নিয়ে ভাবতে চায়।

'যা করতে যাচ্ছেন, ঠিকমত বুঝেশুনে নিয়েছেন তো? টাইমিঙ হচ্ছে আসল, একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ।'

মাথা ঝাঁকাল রাহাত। 'তা নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। সময় হলে আমাকে ফলো করবেন কেবল।'

'বেশ।'

রোজ দুপুর একটায় এসএসদের জন্যে শহর থেকে তাজা মাংস আর সব্জি নিয়ে আসে একটা ট্রাক। আগেও দেখেছে রাহাত, তবে ভাল করে খেয়াল করেনি। গত তিনদিন করেছে—ঠিক একটায় আসে ওটা। ফেরে খালি কার্টন নিয়ে। চালক আর এক সহকারী থাকে ট্রাকে। স্টোর কীপার মাল বুঝে নিয়ে কার্টন ফেরত দেয়ার আগে পর্যন্ত পাশের এক শেডে বসে অপেক্ষা করে ওরা। মূল ক্যাম্প থেকে সামান্য দূরে স্টোর, কাপোদের ল্যাট্রিনের সাথে। রাহাত ঠিক করেছে ওই ট্রাক নিয়ে

পালাবে।

তার আগে ডাইভার্শানের ব্যবস্থা করতে হবে। সেটা কি ভাবে করবে, তাও ভেবে রেখেছে। সময়মত লাঞ্চের সাইরেন বাজল। কাজ রেখে যে যার হাটের দিকে রওনা হলো সবাই। দশটার দিকে শুরু হয়েছে তুষারপাত, একটু একটু করে বাড়ছেই। আকাশ গাঢ় মেঘে ঢাকা; বেশিদূর নজর চলে না।

'ট্রাক নিয়ে সোজা শহরে চলে গেলেই তো পারি আমরা,' বলে উঠল বিজ্ঞানী। মেজর রাহাতের গা ঘেঁষে হাঁটছে।

'সম্ভব নয়। ড্রাইভার আর হেলপারকে ওরা যখন খুঁজে পাবে, তখনই বুঝে ফেলবে কি ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া তো করবেই, সামনে থেকেও বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। কাজেই ওই ঝুঁকি নেয়ার প্রশ্নই আসে না।'

বিশাল ক্যান্টিনে খেয়ে নিল ওরা। সুপ ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে নামতে চাইল না রাহাতের, তবু জোর জবরদস্তি করে খেলো। কোলাহল ছাপিয়ে ট্রাকের আওয়াজ শোনার জন্যে কান খাড়া রেখেছে। দূরাগত এঞ্জিনের শব্দ শোনামাত্র বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, গরম ভাপ বেরোতে শুরু করল নাকমুখ দিয়ে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক থাকার কসরত করতে করতে হাটে এসে ঢুকল ও। মাত্র দু'মিনিট; তারপরই বেরিয়ে এল। সুতীক্ষ্ণধার স্টিলেটোটা তখন কোমরে গোঁজা। কাল গভীর রাতে বরফ খুঁড়ে ওটা বের করেছে রাহাত। রাখার সময় জায়গা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল, অসুবিধে হয়নি। কাপড় চোপড় বের করে লাভ নেই বলে ওখানেই রেখে দিয়েছে। চার-পাঁচ মাস পর বরফ যখন গলবে, নিশ্চই কারও না কারও চোখে পড়বে ওগুলো।

ঘুরে পিছনদিকের একসার ল্যাট্রিনের দিকে চলল ও। তুষারপাতের পরিমাণ এর মধ্যে বেশ বেড়েছে। বাঁক ঘুরে সামনে

তাকাল। দূরে ট্রাকটার কাঠামো আবছামত দেখা যাচ্ছে, এদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে স্টোরের সামনে। রাস্তায় স্টোরকীপারের সাথে কথা বলছে দুই সিভিলিয়ান, নিশ্চই ড্রাইভার আর হেলপার হবে।

পিছনে চাপা পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল রাহাত, বিজ্ঞানীকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'সোজা ল্যাট্রিনে চলে যান। সময় হয়েছে দেখলে বের হবেন, তার আগে নয়।'

বাতাস বাড়ছে। এলোমেলো উড়ছে তুষার। গাঢ় সিসার মত রঙ হয়েছে আকাশের। তার মানে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে। ভালই হলো। সময় কাটাবার জন্যে রাহাতও মিছেমিছি ল্যাট্রিনে ঢুকল। লাঞ্চের পর পনেরো মিনিট রেস্ট, অতএব এখনই ওদের অভাব কারও চোখে পড়বে না ভেবে নিশ্চিন্ত।

ওদিকে মাল খালাস করতে লেগে পড়েছে দুই পোলিশ। মাঝারি আকারের বেশ অনেকগুলো কার্টন স্টোরের গেটে পৌঁছে দিয়ে শেডের দিকে এগোল ওরা। শেডটা কাপোদের ল্যাট্রিনের বাইরের দেয়ালের সাথে, স্টোরকীপারের চোখের আড়ালে। ওদের দিকে পিছন ফিরে বসল লোক দুটো, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

এইবার, ভাবল মেজর রাহাত। সময় হয়েছে।

হাইওয়ে ধরে দক্ষিণে ছুটে চলেছে মেজর নিউম্যানের মার্সিডিজ। তবে গতি যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন নয়। ভেজা, পিচ্ছিল রাস্তায় চল্লিশের ওপর তুলতে সাহস হচ্ছে না শোফারের।

মার্সিডিজ এমনিতে যথেষ্ট হেভি গাড়ি, তারওপর এটা স্টাফ কার, লিমুজিন। আরও হেভি যদি কোনমতে একবার চাকা পিছলে যায়, সর্বনাশ ঠেকানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। তার প্যাসেঞ্জার কোন সাধারণ অফিসার নয়, জানে লোকটা, পোল্যান্ডের গেস্টাপো

চীফ সে। অনেক বড় ব্যাপার। থার্ড রাইখের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাথা স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যান।

কিন্তু মুশকিল হলো মেজর নিজেই তাকে খানিক পর পর আরও জোরে চালাবার তাগাদা দিয়ে চলেছে। সে-ও কম চতুর নয়, নির্দেশ পেলেই গতি বাড়িয়ে দেয়। পরে রিয়ার ভিউ মিররে যেই দেখে মেজর চিন্তায় ডুবে গেছে, খুব ধীরে ধীরে কমিয়ে চল্লিশে এনে স্থির করে। ন'টায় ওয়ারশ ছেড়েছে, এখন প্রায় একটা, এই চলছে গত চার ঘণ্টা ধরে।

ভরসা আছে শোফারের, তার চালাকি যদি মেজর ধরেই ফেলে, তাকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বললে বুঝবে। নিউম্যান যথেষ্ট শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র। অন্য অফিসাররা গাড়িতে উঠলেই কুকুরের মত খ্যাঁক খ্যাঁক করে, এই লোক তা কখনোই করে না। বরং চালকদের সুবিধে-অসুবিধেও বোঝে। বোঝে বলেই র‍্যাডোমের আর্মি পোস্টে পাঁচ মিনিটের ছুটি দিয়েছিল তাকে, কফি খেয়ে গা গরম করে আসার অনুমতি দিয়েছিল।

ওখান থেকে আরও একবার অশউইৎজে ফোন করতে গিয়েও করেনি নিউম্যান। লোভ সামলে নিয়েছে। পথ আর সামান্যই আছে, একবারে গিয়ে হাতনাতে ধরবে ব্যাটাদের। পৌঁছেই গ্রজকে তাৎক্ষণিক সারপ্রাইজ রোল কলের আয়োজন করতে বলবে সে, তারপর ধরবে ইহুদীর বাচ্চা আর মেজর রাহাতকে—সো কলড্ 'স্ট্রাইক ফোর্স' চীফকে। কত্তবড় সাহস শালাদের, থার্ড রাইখকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্যে কি না ফোর্স গঠন করেছে! ক্র্যাক কম্যান্ডো ফোর্স!

চার্চিল শালার দৌড় তো বোঝা হয়েই গেছে। ক্ষমতায় বসার আগে থেকেই ভারি তিড়িং বিড়িং করেছে, কিন্তু যেই জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নিল; বৎস্যহারা গাভীর মত দশা হলো ব্যাটার। দিশে না পেয়ে তামাকখোর বুড়ো তাহলে এই পথ ধরেছে এখন?

স্ট্রাইক ফোর্স! ঠোঁট বেঁকে গেল নিউম্যানের, হাতি টলাতে ছুঁচো? ব্যাটার চেহারাখানা না দেখা পর্যন্ত শান্তি হবে না তার।

নড়চড়ে বসল। শোফারকে আবার জোরে চালাবার নির্দেশ দিয়ে নিজের চিন্তায় ডুবে গেল। একটা মাইলস্টোন সাঁ করে পিছিয়ে গেল, ওটায় বড় করে লেখা: ওসওয়েসিম ১৫ মাইল।

পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল লোক দুটো। যাতে তাকায়, সে জন্যে ইচ্ছে করেই শব্দ করেছে রাহাত। দুই বন্দী দেখে আশ্বস্ত হলো ওরা। সহানুভূতির হাসি ফুটল সরুমুখো ড্রাইভারের মুখে। 'হ্যালো!'

'হ্যালো!' হাসল রাহাত। অপরাধীর চোখে দ্রুত এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলল, 'ল্যাট্রিনে এসেছিলাম, সিগারেটের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে আর থাকতে পারলাম না। আছে নাকি?'

'তা আছে।' উঠে দাঁড়াল চালক, ভারী জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে দিয়ে বলল, 'কিন্তু কেউ যদি...'

আর এগোতে পারল না লোকটা। ডান হাতে তার সোলার প্লেক্সাসের ওপর দড়াম করে মেরে বসল মেজর।

'হুঁক!' করে উঠেই দু'ভাঁজ হয়ে গেল ড্রাইভার, ব্যথায় নীল হয়ে উঠতে শুরু করেছে চেহারা। ভাঁজ পুরো হতে দিল না রাহাত, ডান হাঁটু সবেগে ওপরদিকে তুলল। বাটির সামান্য ওপরে তার থুতনির সাথে সংঘর্ষে যে ঝাঁকি লাগল, তাতে বুঝে নিল কাজ যুৎসই হয়েছে। কম করেও দুটো দাঁত হারিয়েছে ব্যাটা। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারল ও এবার, ডান হাতের কিনারা সটান সোজা রেখে ধাঁই করে মারল কানের সামান্য নিচে। দাঁড়ানো অবস্থায়ই চোখ উল্টে গেল লোকটার। রক্তে ঠোঁট আর থুতনি একাকার।

কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার সময় নেই, ব্যাপার বুঝে উঠতে সামান্য সময় লাগলেও ততক্ষণে একলাফে দাঁড়িয়ে পড়েছে সহকারী। পা তুলেছে দৌড় দেবে বলে, একই সঙ্গে চিৎকার দেয়ার জন্যে মুখও খুলেছে। আধ পাক ঘুরে ওখানেই আগে মারল মেজর। শুরু না হতে পারা চিৎকার উৎসে ফেরত পাঠিয়ে ল্যাঙ মারল লোকটাকে। বরফের ওপর নাক দিয়ে আছড়ে পড়ল সে হুড়মুড় করে। পড়েই ঝট্ করে চিত হলো, একই মুহূর্তে দুই হাঁটু ভাঁজ করে তার পেটের ওপর পড়ল রাহাত।

উত্তেজনায় লক্ষ্য ঠিক ছিল না বলে এক হাঁটু সামান্য ওপরে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মট্ করে শব্দ হলো। পাঁজরের একটা হাড় গেছে। পরক্ষণে কানের পাশে ওর ফাইন্যাল পাঞ্চ খেয়ে নেতিয়ে পড়ল সহকারী। কলার ধরে অজ্ঞান দেহটা শেডের নিচে টেনে আনল ও, শুইয়ে দিল সঙ্গীর পাশে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। জেরি লুবানস্কি বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাত তফাতে। ওর অকল্পনীয় রুদ্রমূর্তি দেখে আহাম্মক বনে গেছে সে।

খেয়াল করল না রাহাত। এখন এক মুহূর্ত সময়ও নেই নষ্ট করার মত। পালাতে হবে। যে কোন সময়ে যে কেউ এসে পড়তে পারে। ল্যাট্রিনে ঢুকতে বা বেরোতে উঁকি দিলেই শেষ। তবে ওদের কপাল খুব বেশি ভাল যে এরমধ্যে তুষারপাতের পরিমাণ আরও বেড়েছে, প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে চারদিক।

টেনে-হিঁচড়ে অজ্ঞান দেহ দুটো বেঞ্চের ওপর তুলল দু'জনে মিলে। ওদের জ্যাকেটের ওপরের দিকের তিনটে করে বোতাম খুলল রাহাত, দুই আস্তিন যতদূর আসে টেনে নামিয়ে এক করে গিঁট দিয়ে দিল দেহের পিছনে। মুখ কষে বাঁধল ওদেরই রুমাল দিয়ে। কারও মধ্যে নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে বসে বসে। নিশ্চিন্ত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রাহাত। 'থাকুন এখানে। আমি আসছি।'

'দেরি হবে না তো?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল জেরি লুবানস্কি।

উত্তর দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল ও, সাইরেন বেজে উঠতে থেমে গেল। বিশ্রামের সময় শেষ, কাজে যাওয়ার ডাক পড়েছে। নিশ্চিন্ত হলো রাহাত। এখন আর কারও এদিকে আসার চান্স নেই। 'না। যাব আর আসব।'

অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে স্টোরের দিকে ছুটল ও। এমন অবস্থা যে পাঁচ হাত দূরেও ঠিকমত দেখা যায় না। কাঠের তৈরি প্রকাণ্ড স্টোরের সামনে এসে দাঁড়াল মেজর। দুটো অংশ স্টোরের, একদিকে থাকে বিল্ডিঙ ম্যাটেরিয়াল, পেট্রল ইত্যাদি, অন্যদিকে খাবার-দাবার। গেট একটাই।

এক ট্রুপার আছে পাহারায়। বরফের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এন্ট্রান্সের সামান্য ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। সামনেই নড়াচড়া টের পেয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কি চাও তুমি?' কাঁধে ঝোলানো শেমিসারের স্ট্র্যাপ বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে পেঁচিয়ে ধরে ওর দিকে এক পা এগোল।

'আরও পেট্রল দরকার। পিটের আগুন বরফের যন্ত্রণায় জ্বালিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছে,' বলতে বলতে তার পাঁচ হাতের মধ্যে চলে এল ও।

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। খুব স্বাভাবিক। 'পাস?'

'এই যে,' ইউনিফর্ম পাজামার পকেটে ডান হাত ভরে স্টিলেটোর বাঁট শক্ত করে ধরল মেজর, আরেক পা এগোল। পরমুহূর্তে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল চোখ, গার্ডের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে কিছু দেখছে। 'হের স্টার্মব্যানফিউরার!'

বোকা বনে গেল গার্ড, চোখ কুঁচকে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল। এবং পিছনটা ফাঁকা দেখে মুহূর্তে বুঝে ফেলল ভুল হয়ে গেছে। ঝট্কা মেরে কাঁধের অটোম্যাটিক নামাবার চেষ্টা করল, হলো না, কারণ তার চেয়ে বহুগুণ ফাস্ট রাহাত। ছুরির ধারাল প্রান্ত নিজের

দিকে রেখে ডান হাত বিদ্যুৎগতিতে বাঁ দিকে চালাল ও সিকি বৃত্তের মত ঘুরিয়ে, সুচলো, ডগা ঘ্যাঁচ করে পুরো গেঁথে দিল গার্ডের গলার পাশে। পরক্ষণে হ্যাঁচকা একটানে বের করে আনল জুগুলার ভেইন দু'টুকরো করে দিয়ে। রক্ত ছুটল ফিন্‌কি দিয়ে।

গুঙিয়ে উঠল গার্ড, কিন্তু গোঙানির মত শোনাল না সেটা, শোনাল পানিতে বুদ্বুদ্ ওঠার মত। এক পা পিছিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে, ফোয়ারার মত ওপরমুখো হয়ে ছোটা রক্তে ভেসে গেল ভয় আর অবিশ্বাসের মুখোশ পরা চেহারা। তার ইউনিফর্মে ছুরি মুছে পকেটে ছেড়ে দিল মেজর, হোলস্টার থেকে টান মেরে বের করে নিল ওয়ালথার। চেক্ করে সন্তুষ্ট হলো, ফুল লোডেড।

এক হাতে স্টোর কীপারের জন্যে ওটা প্রস্তুত রাখল রাহাত। এখনও ভেতরে আছে সে, বোধহয় মাল সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত। মৃত গার্ডের রক্তের ফোয়ারা গতি হারিয়েছে এরমধ্যে, অল্প অল্প বের হচ্ছে এখন।

দ্রুত কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল ও। এক মাথার ফুড স্টোরের বন্ধ দরজার ওপর নজর রেখে এক ক্যান পেট্রল ট্রাকের কাছে রেখে ফিরে এল তক্ষুণি। লাথি মেরে বড় বড় কয়েকটা পেট্রলের ক্যান মেঝেতে ফেলে দিল। ঝাঁকিতে মুখ খুলে হড়হড় করে গড়িয়ে নামতে শুরু করল পেট্রল। মৃত গার্ডকে গোসল করিয়ে রক্ত ধুয়ে নিয়ে পুরো ফ্লোর ভাসিয়ে দিল। সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে এল রাহাত, ট্রাক ড্রাইভারের দেশলাইটা বের করল। গেটের কাছের শুকনো জায়গায় সরে এসে একটা কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিল ভেতরে।

হুপ্ করে চাপা আওয়াজ উঠল, চতুর্দিকে ছুটল আগুন তীরবেগে। দেখতে দেখতে দৌড়ে ছুঁয়ে ফেলল পুরো ফ্লোর। ঘুরেই ছুটল রাহাত, একই মুহূর্তে বুম! করে আস্ত এক পেট্রল ক্যান ফাটল। একটুপর আরেকটা, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা...আরও

একটা···আরও···। ভয়াবহ চাপা হুঙ্কারের সাথে বিস্ফোরিত হতে থাকল ওগুলো, একটুপর আওয়াজগুলোকে আর আলাদা করে চেনার উপায় থাকল না। দৌড়ের ওপর ঘুরে তাকাল ও। টকটকে লালচে-কমলা আগুন মহা আনন্দে উদ্বাহু নৃত্য করছে ভেতরে, গাঢ় কালো ধোঁয়া ঝোড়ো মেঘের মত অনবরত পাক্ খাচ্ছে। মোচড় খাচ্ছে। খোলা গেট পেরিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে এখনই।

হোঁচট খেতে খেতে শেডে পৌঁছল ও। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বিজ্ঞানীকে, ভয়ে আধমরা হয়ে আছে। ওদিকে দুই পোলিশের জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই তখনও। ধোঁয়া দেখলেই কেউ না কেউ খোঁজ নিতে আসবে, সে জন্যে পুরোপুরি তৈরি থাকতে হবে বলে পরের কাজ অসম্ভব দ্রুততার সাথে করল রাহাত। কয়েক ক্ষিপ্র টানে ব্যাটাদের ভারী পোশাকের ভারমুক্ত করে নিজেরা পরে নিল ওগুলো।

বেশ আঁটো হলো দু'জনেরই, তবে ট্রাকে বসা থাকলে ব্যাপারটা কারও চোখে পড়বে না ভেবে মাথা ঘামাল না তা নিয়ে। শুধু আন্ডারশার্ট, আন্ডারপ্যান্ট ও পুরু মোজা পরা দুই পোলিশকে বেঞ্চে একজনের ওপর আরেকজনকে শুইয়ে নিজেদের ইউনিফর্ম দিয়ে ঢেকে দিল রাহাত। আশা করছে জমে মরার আগেই জার্মানদের চোখে পড়বে ব্যাটারা। ইঙ্গিতে বিজ্ঞানীকে ট্রাক দেখাল ও। 'হারি আপ্!'

ওটার পিছনে এসে দাঁড়াল রাহাত। ক্যানটা ওপরে তুলে ড্রপ শীট্ টেনে ভাল করে ঢেকে দিল ক্যারিয়ার। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে ক্যাবের দিকে ছুটল, পিছনে তখন পুরো স্টোর দাউ দাউ করে জ্বলছে। অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে রাহাত, এমন সময় আচমকা তুষারের পর্দা ঠেলে কেউ সামনে এসে পড়ল। সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেল না ও, সোজা গিয়ে পড়ল তার ওপর।

'হারামজাদা পোলিশ শিট্!' হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। 'চোখের মাথা খেয়ে এসেছ নাকি?'

চোখ কপালে উঠল রাহাতের। লোকটা আর কেউ নয়, মেজর গ্রজ।

ওসওয়েসিমের ১০ মাইল আগে ধৈর্য হারাল মেজর নিউম্যান। খসে পড়ল তার ভদ্রতার মুখোশ। সামনে একটা ঘোড়ায় টানা ওয়াগন ফেঁসে গেছে রাস্তার মাঝখানে, এগোতে পারছে না তার স্টাফ কার।

পিছনের গাড়ি চিনতে পেরে অনেক আগেই চালকের ঘাম ছুটে গেছে, পথ থেকে ওয়াগন সরাবার চেষ্টা করছে সে মরিয়া হয়ে। কিন্তু ঘোড়া নির্বিকার। মনিবের ব্যগ্রতা মোটেই স্পর্শ করছে না তাকে। পাঁচ মিনিট পরও যখন কাজ হলো না, শোফারের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল মেজর, 'আর এক মিনিটের মধ্যে যদি ব্যাটা পথ থেকে না সরেছে, ওকে গুলি করে পথ পরিষ্কার করবে তুমি। হারামজাদা ইচ্ছে করে রাইখের ট্রান্সপোর্টের পথ আগলে রেখেছে।'

ঢোক গিলল শোফার। 'ইয়েস, মিয়েন স্টার্মব্যানফিউরার।'

অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার দরকার হলো না। খানিকটা সরে গিয়ে পথ করে দিল ওয়াগন, ফাঁক গলে ভোঁ করে বেরিয়ে ছুট লাগাল মার্সিডিজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ঘড়ি দেখল নিউম্যান—ঠিক দেড়টা। আশা করা যায় আর আধঘণ্টার মধ্যে অশউইৎজ পৌঁছতে পারবে সে।

ভেতরে ঢুকেই কি ভাবে কি করবে, মনে মনে তার মহড়া দিতে শুরু করল লোকটা।

'তুমি!' হুঙ্কার ছাড়ল গ্রজ। চরম বিস্ময়ে দ্রুত কয়েকবার রাহাতের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে সাঁৎ করে হাত বাড়াল হোলস্টারের

দিকে। 'এই পোশাকে···হারামজাদা!'

ব্যাপারটা ওর সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বুঝে উঠতে পারল না রাহাত। কিন্তু তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে সময় নষ্টও করল না, গ্রজ নিজের অস্ত্র ছুঁতে পারার আগেই গার্ডের ওয়ালথার স্প্রিঙের মত একলাফে বেরিয়ে এল ওর হাতে। 'সরি, হের কোমান্ড্যান্ট,' অমায়িক হাসি দিল। 'ইচ্ছে ছিল তোমার হিসেব পরে চুকাব, কিন্তু তোমার নিয়তি ধৈর্য ধরতে পারেনি। সত্যি দুঃখিত। গো টু হেল্!'

ধোঁয়া দেখে কারণ জানতে এসেছিল মেজর, কিন্তু জায়গামত পৌঁছার আগেই এতসব অকল্পনীয় চমক দেখতে হবে স্বপ্নেও ভাবেনি। হাতের ব্যস্ততা থেমে গেল তার, নাকের সামনে একচোখা মৃত্যুদূতটাকে দেখে চরম অবিশ্বাসে হাঁ হয়ে গেল। একই মুহূর্তে তপ্ত মৃত্যু বর্ষণ করল রাহাতের ওয়ালথার। গ্রজের দুই সারি সুগঠিত দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঢুকে টাক্‌রা চুরমার করে, খুলির খানিকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল বুলেট। আওয়াজটা বধ্যভূমির বিরামহীন গোলাগুলির সাথে মিলেমিশে এক হয়ে গেল। কেউ যদি কান খাড়া করে বসে না থেকে থাকে, তাহলে আলাদা করে চিনতে পারবে না ওটাকে। টের পাবে না, সম্পূর্ণ উল্টোদিকে হয়েছে শব্দটা।

বিদেহী গ্রজ মাটি ছোঁয়ার আগেই একলাফে ট্রাকের ফুটবোর্ডে উঠে পড়ল রাহাত, পরমুহূর্তে ক্যাবের ভেতরে। এতকিছু ঘটতে সময় লেগেছে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। স্টার্ট দেয়াই ছিল, ঝাঁকি খেয়ে এগোতে শুরু করল ট্রাক। অস্পষ্ট হাঁকটাও ঠিক তখনই কানে এল রাহাতের।

দৌড় প্রতিযোগিতায় সামান্য পিছনে পড়ে গিয়েছিল গ্রজের স্টাফ অফিসার, আচমকা পর্দার ফাঁক গলে বেরিয়ে এল ব্যাটা। এবং এসেই দেখে ফেলল চীফের লাশ। থমকে গিয়ে উইন্ডশীল্ডের

দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কিছু বলল সে, থাবা দিয়ে পিস্তল বের করে আনল। বিজ্ঞানী ভয়ে আঁতকে উঠল, কিন্তু রাহাতের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ঝুঁকে বসে এক্সিলারেটর ফুটবোর্ডের সাথে ঠেসে ধরল কেবল, স্টিয়ারিঙ হুইল ঘোরাল বন্ বন্ করে। চোখের পলকে বাঁ দিকের ফেন্ডারে বাড়ি খেল ক্যাপ্টেন, কয়েক গজ উড়ে গেল। পিস্তল ছিট্‌কে পড়েছে হাত থেকে।

আছড়ে পড়েই ধড়মড় করে উঠে পড়ল লোকটা, আতঙ্কিত চেহারায় চিৎকার করতে করতে সামনে থেকে সরে যেতে চেষ্টা করল। প্রায় গিয়েওছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একদম শেষ মুহূর্তে পা পিছলে গেল বরফে। আবার পড়ে গেল উপুড় হয়ে। পরক্ষণে তার দুই পায়ের ওপর চড়ে বসল স্নো চেইন দিয়ে মোড়া হেভি টায়ার। ঝাঁকি খেল ট্রাক, মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের পায়ের হাড়-মাংস পাটায় পেশা মশলা বানিয়ে ফেলল।

মরণ যন্ত্রণায় চ্যাঁচাতে চাইল হপ্টস্টার্মফিউরার, কিন্তু সে সময়ও পেল না। পা ছেড়ে ওপরে উঠল টায়ার, নিম্নাঙ্গের সমস্ত হাড়গোড় চুরচুর করে পেট ফাটিয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলল। পিষে দিল বুকের খাঁচা, হৃৎপিণ্ড। সবশেষে মাথাটাকে পচা আপেলের মত গুঁড়িয়ে দিয়ে ছুটল ট্রাক।

ক্যাবের ব্যাক উইন্ডো দিয়ে চকিতে পিছনটা দেখে নিল মেজর রাহাত। না, আর কোন নড়াচড়া নেই। কেউ ছুটে আসছে না বাধা দিতে। তবে স্টোরের আগুন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। দরজা-জানালা দিয়ে বেরিয়ে লক্ লক্ করছে আগুনের অসংখ্য জিভ। জোর করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল ও। নতুন কোন বিপদ যখন আসছে না, তখন ওরও হুড়োহুড়ি করা ঠিক হবে না। ধীরেসুস্থে এগোনো ভাল।

একটু পরপর দুটো বাঁক নিয়ে বড় রাস্তায় উঠে পড়ল রাহাত,

বিজ্ঞানীকে শক্ত হয়ে বসতে বলে মাঝারি গতিতে মেইন গেটের দিকে চলল। আর বড়জোর একশো গজ দূরে আছে ওটা, ভাবতেই বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। গলা-বুক শুকিয়ে উঠল। আড়চোখে বিজ্ঞানীকে একপলক দেখে নিল ও। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে আছে মানুষটার চেহারা। একহাতে ড্যাশ বোর্ড আঁকড়ে ধরে বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে আছে। অনবরত ঠোঁট নড়ছে। কী সব বলছে বিড়বিড় করে। মনে হলো কষে এক ধমক দিলে কেঁদে উঠবে হাউমাউ করে।

আর পঞ্চাশ গজ!

কিছু সময়ের জন্যে তুষারপাতের পরিমাণ কমে গেল, পর্দাটা হালকা হলো। গেটের হাট থেকে এক আন্টারশাহরফিউরারকে (সার্জেন্ট) রাস্তায় বেরিয়ে আসতে দেখল মেজর, গেট খুলতে যাচ্ছে। আচমকা থমকে দাঁড়াল লোকটা, ওদের ছাড়িয়ে পিছনে চলে গেছে নজর। হাঁ করে আকাশ দেখছে। ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে নিশ্চই।

চকিতে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল রাহাতের। জানালার কাঁচ নামিয়ে বুক পর্যন্ত বের করে সন্ত্রস্ত গলায় চ্যাঁচাতে লাগল, 'গেট খুলুন, গেট খুলুন! স্টোরে আগুন লেগেছে! হের কোমান্ড্যান্ট ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করেছেন, ওরা আসছে! জলদি বের হতে দিন আমাকে, জলদি...'

পড়িমরি করে গেটের দিকে ছুটল সার্জেন্ট, হাঁ করে খুলে দিল পুরোটা। ধোঁয়া দেখে এবং 'স্টোরে আগুন' আর 'ফায়ার ব্রিগেড' শুনে মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে ব্যাটার। একবারও ভাবল না, খবরটা যখন এতই জরুরি, ড্রাইভার লোকটা তাহলে এতক্ষণ হেলেদুলে আসছিল কেন? কেন হঠাৎ করে এত ব্যস্ত হয়ে উঠল?

বুকের ভেতরের উল্লাস আর হাসি অনেক কষ্টে চেপে রাখল

রাহাত। পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় চেঁচিয়ে বলল, 'গেট খোলা রাখবেন! বন্ধ করবেন না, এখনই ফায়ার ব্রিগ্রেড...'

ব্যস্ত হয়ে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট, হাত নেড়ে দূর হয়ে যেতে বলল। চোখ ধোঁয়া দেখায় ব্যস্ত। বিশাল এক ব্যাঙের ছাতার আকার পেয়েছে তখন ধোঁয়ার মেঘ, ঢেকে ফেলেছে অশউইৎজের আকাশ।

এগারো

তুমুল বেগে গেট পেরিয়ে এল মেজর রাহাত খান, লেজ দাবিয়ে প্রাণপণে ভাগতে লাগল। সাইড মিররে পিছনের দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে–তেলতেলে ধোঁয়ায় অসউইজের গোটা আকাশ ছেয়ে গেছে। গেটটা আউট অভ ফোকাস হয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ওখানটায় আরও কিছু এসএস জড়ো হয়েছে দেখল ও।

আচমকা গাঢ় হয়ে এল আবার ঘোলাটে পর্দাটা, দৃষ্টিসীমা পনেরো-বিশ গজে নেমে এল ঝপ্ করে। বাতাসের তোড়ে এলোমেলো উড়ছে সাদা পালকের মত তুষার। বাধ্য হয়ে হেডলাইট ডীপ করে জ্বেলে দিল রাহাত, সাবধানে এগোতে থাকল।

বিজ্ঞানী সহজ হয়ে বসল। বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা দম ছাড়ল সশব্দে। 'আমরা...তাহলে সত্যি বেরিয়ে এসেছি!' আপনমনে বলল। 'ওহ্, গড! বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

পাল্টা কিছু বলতে যাচ্ছিল মেজর, আঁতকে উঠে থেমে গেল। একেবারে বিনা নোটিশে বিশাল ব্যারেলের মত কি যেন একটা গড়াতে গড়াতে বাঁক ঘুরেই ওদের মুখোমুখি হলো। সংঘর্ষ এড়াতে মরিয়া হয়ে হুইল ঘোরাল ও, বাধ্য হলো সরু পথের ঢালে ট্রাকের এক সাইড নামিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলতে।

ব্যারেলটাও শেষ মুহূর্তে দেখেছে ওদের, সাঁই সাঁই করে বিপরীত দিকে নাক ঘুরিয়ে কোনমতে গুঁতো এড়াল ওটার চালক। প্রকাণ্ড এক ফায়ার এঞ্জিন ওটা। এপাশের আগা মাথা লম্বা পাদানিতে ইউনিফর্ম পরা বেশ কয়েকজন ফায়ার ফাইটার দাঁড়িয়েছিল, পর্দা ফুঁড়ে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ওদের উদয় হতে দেখে আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল লোকগুলোর চেহারা। খুব অল্পের জন্যে জানে বেঁচে গেছে, পথ থেকে সরে যেতে এক সেকেন্ড দেরি হলে ট্রাকের ঘষায় চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেত প্রত্যেকে। মুহূর্তে উল্টোদিকে হাওয়া হয়ে গেল ওটা।

বেশ অবাক হলো রাহাত ওরা এত তাড়াতাড়ি কি করে খবর পেল ভেবে। কে করল ফোন? নাকি ধোঁয়া দেখে নিজেরাই এসেছে? জাহান্নামে যাক, সে খবরে ওর দরকার কি?

ফাঁড়া কেটে গেছে দেখে ধাতস্থ হলো রাহাত, ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিয়ার এনগেজ করল, রাস্তা আর বরফ কামড়ে ঘুরতে শুরু করল চাকা। ক্যাম্পের চার মাইল দূরে ট্রাক ছেড়ে নেমে পড়ার প্রস্তুতি নিল ও। এটা নিয়ে আর এগোনো বিপজ্জনক। এতক্ষণে নিশ্চই মেজর আর ক্যাপ্টেনের লাশ চোখে পড়েছে ওদের। তেড়ে এল বলে।

চট্ করে ব্রেক পেডাল ঠেসে ধরল ও, ভেজা রাস্তায় পিছলে গেল পিছনের চাকা, ঘুরে গেল ট্রাক। আড়াআড়ি হয়ে পুরো রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল। 'নামুন!' একটা কথাও বলল না লুবানস্কি। নেমে দূরে সরে গিয়ে মেজরের কাজ দেখতে লাগল।

ড্রপ শীট সরিয়ে ক্যারিয়ারে উঠল রাহাত, ক্যানের পেট্রল ছড়িয়ে গোসল করাতে লাগল ট্রাকটাকে। কাজ সেরে নিরাপদ দূরত্বে সরে এল, দেশলাইর কাঠি জ্বেলে পথে গড়িয়ে পড়া পেট্রলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল। লাফিয়ে উঠে ছুটল আগুন। দেখতে দেখতে বহ্নুৎসব শুরু হয়ে গেল।

'এতকিছু ভেবে রেখেছিলেন!' মৃদু গলায় মন্তব্য করল বিজ্ঞানী। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেজরের দিকে। আগুনের আভায় ওর দৃঢ়সংকল্প চেহারা জ্বলজ্বল করছে দেখল সে।

আগুন ভালমত ধরে উঠতে আশ্বস্ত হলো রাহাত। এখন আর গাড়ি নিয়ে ওদের তাড়া করার উপায় নেই ক্যাম্পের এসএসদের। আগুন না নেভা পর্যন্ত পথ বন্ধ।

'চলুন,' ঘুরে দাঁড়াল ও। 'যাওয়া যাক।'

পাশাপাশি এগোল দু'জনে। কয়েক পা গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে রাহাতকে দেখল লুবানস্কি। 'এতকিছু হলো, অথচ আপনার পরিচয় জানা হলো না আজও।'

'কি হবে জেনে?' শ্রাগ করল মেজর। 'ব্যক্তি পরিচয় জেনে লাভ কি? আমি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি, এইটুকুই জেনে রাখুন। তাছাড়া...'

'বুঝেছি।' একটু ভাবল লোকটা। 'আমাকে উদ্ধার করার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'তারও কোন প্রয়োজন নেই। আমি স্রেফ আমার কর্তব্য করেছি।'

মৃদু কুঞ্চন ফুটল তার কপালে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আনার জন্যে খুব খারাপ লাগছে। মুক্তির আনন্দ পুরো অনুভব করা যেত ও সঙ্গে থাকলে।'

মেজর কিছু বলল না। গত কয়েকদিন যাদের সাথে কেটেছে, তাদের কথা–ঘটনা ছায়াছবির মত ভাসছে ওর চোখের সামনে।

অসুস্থ আনা কাইবাল্টনা, ইরমা লিনয, মেজর গ্রজ, প্রকাণ্ডদেহী কাপো কযিনস্কি, তাদুয়েস ম্যান, আঁদ্রেই ও ওয়েসল, পিট, ফায়ারিঙ স্কোয়াড, সব একের পর এক হানা দিয়ে যাচ্ছে মনের পর্দায়। অভিশপ্ত অশউইৎজের বীভৎস স্মৃতি কতকাল ওকে তাড়া করে বেড়াবে কে জানে? জার্মানদের এই নারকীয় যজ্ঞ ঠেকাতে পারবে কি না ব্রিটেন, তাই বা কে জানে?

'ঠিক বলেছেন,' অনেকক্ষণ পর বলল ও।

'প্রার্থনা করি ওর পরকাল যেন সুখের হয়।'

বিস্ফোরণের শব্দে পিছনে তাকাল মেজর, জ্বলন্ত ট্রাকের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ফেটেছে। আগুনের তেজ বেড়ে গেছে অনেক। তবে বেশ আবছা হয়ে এসেছে ওটা, পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে বেশি দেরি নেই।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' বলে উঠল বিজ্ঞানী। 'কতদূর হাঁটতে হবে?'

'বেশি না। আর সামান্য।' সিগারেট বের করার জন্যে পকেটে হাত ভরল রাহাত, পরক্ষণে জমে গেল দুটো ডীপড্ হেডলাইট দেখে।

সামনের বরফের স্তূপের জন্যে দেখতে পায়নি গাড়িটাকে, এঞ্জিনের আওয়াজও শোনেনি, যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হয়েছে ওটা। যখন দেখল, তখন আর গা ঢাকা দেয়ার সময় নেই। একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তুষারমোড়া একটা জার্মান স্টাফ কার ওটা। গরম বলে শুধু বনেটে তুষার জমতে পারেনি, জায়গাটা ভেজা।

চট্ করে ওয়ালথারের বাঁট মুঠো করে ধরল ও, চাপা গলায় লুবানস্কিকে সতর্ক করল, 'দৌড় দেবেন না। স্বাভাবিক থাকুন।'

ঠিক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। বনেটে

গেস্টাপো ফ্ল্যাগ দেখে ঢোক গিলল রাহাত। ড্রাইভারের জানালার কাঁচ খানিকটা নেমে গেল। 'এটাই অশউইৎজের রাস্তা তো?' জিজ্ঞেস করল সে। রাহাত মুখ খোলার আগেই পিছনের ক্যাব লাইট জ্বলে উঠল, নামতে শুরু করল কাঁচ। আতঙ্কিত চোখে মেজর নিউম্যানকে দেখল রাহাত। সেও দেখছে ওকে স্মোকড্ গ্লাসের পিছন থেকে। 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে!'

জবাব হাতড়াচ্ছে ও, এই সময় লুবানস্কির ওপর চোখ পড়তেই বিস্ফোরিত হলো নিউম্যান। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'লুবানস্কি! জেরি লুবানস্কি!!'

পরক্ষণে আবার রাহাতের দিকে তাকাল ঝট্ করে। একটানে বের করে ফেলেছে পিস্তল। 'মেজর রাহাত! স্ট্রাইক ফোর্স!!'

মনে মনে আস্ত এক ডিগবাজি খেয়ে উঠলেও সময় নষ্ট করল না ও, চট্ করে ওয়ালথার তুলল লোকটার কপাল সোজা। নিজেরটা হোলস্টার থেকে বের করেছে ঠিকই নিউম্যান, কিন্তু হাত তখনও উইন্ডো ফ্রেমের নিচে। সেকেন্ডের জন্যে হেরে গেল সে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বের করো!' মাথা ঝাঁকিয়ে উৎসাহ দিল রাহাত। 'কি ওটা, নিউম্যান, প্যানজার অ্যাবওয়ের কামান? বের করো, তাহলে তোমাকেও মেজর গ্রজের কাছে নরকে পাঠাতে সুবিধে হয় আমার।'

সিকি ইঞ্চি ওপরে উঠল নিউম্যানের বিস্ফারিত চোখ। সম্মোহিত দৃষ্টিতে ওর প্রতিটি নড়াচড়া দেখছে। 'গ্রজ...!'

'হ্যাঁ, নরকে গিয়ে তোমাদের জন্যে স্পেশাল পিট তৈরি করছে এখন। তোমরা একজন-দু'জন করে যাবে, আর সে...' থেমে শোফারের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'হোল্ড ইট! আর একচুল নড়লে খুলি ফুটো করে দেব তোমার।'

ডান হাত নড়ছিল লোকটার, ধমক খেয়ে থেমে গেল।

একেবারে জমে বসে থাকল সে। 'দুই হাত হুইলের ওপর রাখো,' নির্দেশ দিল মেজর। 'আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, গুড! সীট স্টীল, যদি বেঁচে থাকতে চাও।'

পিছনে মন দিল ও। 'তারপর, হের স্টার্মব্যানফিউরার! কি যেন বলছিলে? হ্যাঁ, চেনা লাগারই কথা। কিছুদিন আগে ওয়ারশর রাস্তায় তোমার গাড়ি আটকে গিয়েছিল, তখন আমাকে দেখেছ তুমি। মনে পড়েছে? এবার তোমার কামানটা দাও। খুব সাবধানে, উল্টো করে।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলেও উপায় নেই দেখে শেষ পর্যন্ত তাই করল মেজর। ওটা পকেটে পুরে চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও। 'এবার একটা জটিল অঙ্কের সমাধান দাও দেখি, তুমি আমাকে চিনলে কি করে? স্ট্রাইক ফোর্সের খবর জানলে কি করে?'

জবাব নেই। রাগে ফুঁসছে স্টার্মব্যানফিউরার।

'কি ভাবে জানলে, নিউম্যান!' গম্ভীর, থমথমে হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'চুপ থেকে আমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে যেয়ো না, ভুল করবে তাহলে। মুখ খোলো। খবরটা আমাকে জানতে হবে যে করে হোক।'

'বলব না।'

গুলি করল রাহাত। চমকে উঠল সবাই। মেজরের চোখা নাকের ডগা ঘেঁষে ব্যাক কুশনে সেঁধিয়ে গেল বুলেট। 'এবারেরটা এক ইঞ্চি বাঁ দিক ঘেঁষে যাবে, নিউম্যান। আমি সিরিয়াস।'

ফ্যাকাসে চেহারায় ওকে দেখল সে। ঠোঁট কাঁপছে। 'তুমি আমাকে বড়জোর বন্দী করতে পারো, কিন্তু এভাবে বিনা কারণে মেরে ফেলতে পারো না। আমি...'

'তাই নাকি?' ঠোঁট বেঁকে গেল রাহাতের। 'নীতি কথা শোনাচ্ছ? অসউইজে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারছ তোমরা

বিনাবিচারে। দুধের বাচ্চাদের পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছ না। আমাকে না শুনিয়ে ওদের কেন শোনাও না কথাটা? তোমরা যাদের মারছ, ওরা মানুষ। আর আমি যাকে মারতে যাচ্ছি, সে যে কী, আমি জানি না। কাম অন, নিউম্যান। অনর্থক খুনোখুনি পছন্দ নয় আমার। তথ্যটা দাও, তারপর নির্বিঘ্নে চলে যাও যেদিকে যাচ্ছিলে। আমি বাধা দেব না।'

ঢোক গিলল মেজর। ওয়ালথারের বাঁটে রাহাতের চেপে বসা রক্তশূন্য তর্জনীর ওপর নজর স্থির হয়ে আছে। 'বলছি।'

আঙুলে ঢিল দিল ও। 'বলো।'

'কিন্তু তুমি তোমার কথা রাখবে, তার গ্যারান্টি কি?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল ও। 'কোন গ্যারান্টি নেই। তবে আমি কাউকে কোন কথা দিলে তা রাখি।'

কিছুক্ষণ ওর অবিচল মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস মোচন করল সে। জেরি লুবানস্কিকে দেখে নিল এক পলক। 'লন্ডন থেকে খরবটা জানানো হয়েছে আমাকে। আজই জেনেছি।'

ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল রাহাতের। 'কি ভাবে?'

'চিঠিতে।'

হাত বাড়াল ও। 'দেখি!'

'কি?'

'চিঠি।'

'কিন্তু ওটা কোডেড। দেখে বোঝা...'

'দেখি!' একই ভঙ্গিতে বলল ও।

খামসহ চিঠি বের করে দিল মেজর। তাকে দিয়েই চিঠি বের করিয়ে চোখ বোলাল রাহাত। ঠিকই বলেছে ব্যাটা, কোডেড চিঠি। ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে ভেতরের বার্তা উদ্ধার করতে। 'কার লেখা এটা?'

একটা নাম বলল নিউম্যান, সঙ্গে সঙ্গে ফের গুলি করল

রাহাত। সশব্দে আঁতকে উঠল মেজর। ড্রাইভার কেঁপে উঠল। 'আমি আসল নাম জানতে চেয়েছি, নিউম্যান,' থমথমে গলায় বলল ও।

'ভুয়া বলেছি কেন মনে হলো তোমার?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল লোকটা, কিন্তু রাহাত মুখে জবাব দেয়ার বদলে আবার ওয়ালথার তুলতে যাচ্ছে দেখে মাথা ঝাঁকাল। আরেকটা নাম উচ্চারণ করল।

সন্তুষ্ট হলো ও। একটু আফসোসও জাগল মনে। 'কতদিন থেকে এ কাজ করছে সে?'

'অনেকদিন।'

'অলরাইট। নামো গাড়ি ছেড়ে।'

'কেন?' চোখ কোঁচকাল মেজর।

'বাকি পথ হেঁটে যেতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু...'

'শাট আপ্!' কড়া ধমক লাগাল রাহাত। 'আমি মত পাল্টাবার আগে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ো। কিসের ফাইল ওটা, জেরি শুবানস্কির? ওটা দিয়ে আর কি করবে মানুষটাই যখন ফসকে গেল? দিয়ে দাও।'

দিল নিউম্যান, মুখ ব্যাজার করে বেরিয়ে এল। অসহায়ের মত তাকাল সামনের দিকে। উষ্ণ কারের ভেতর থেকে বেরিয়ে ঠাণ্ডার কামড় একটু বেশিই লাগছে তার বোঝা গেল। ওদের দুই অস্ত্র খালি করে ফিরিয়ে দিল রাহাত। শোফারের পায়ের কাছে একটা শেমিসার ছিল, ওটা বের করল না।

'ওয়ারশ থেকে এতপথ এসকর্ট ছাড়া এসেছ,' শ্রাগ করল রাহাত। 'তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। তবে বাকি পথ সাবধানে যেয়ো। গুলি নেই, গাড়ি নেই, কোন পোলিশ শিটের সামনে পড়লে কিন্তু নিজেই শিট্ বনে যাবে। যাও, নাক বরাবর

সোজা।'

মুখ দেখে মনে হলো কিছু বলতে চাইছে মেজর, কিন্তু কি ভেবে শেষে মত পাল্টাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে হাঁটতে শুরু করল। শোফার পিছন পিছন চলল অনুগত আজ্ঞাবহের মত। কয়েক পা যায় আর ঘুরে ঘুরে তাকায় ব্যাটা।

'উঠে পড়ুন,' বিজ্ঞানীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রাহাত। 'চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে।'

একটু পর ঘুরে গেল লিমুজিন, র‍্যাডোমের দিকে ছুটে চলল হাঁ হাঁ করে। অসউইজমুখী মাইলস্টোন দেখে এগোল রাহাত, ৮ সংখ্যা চোখে পড়তে গতি কমাল। আরও মাইলখানেক গিয়ে গাড়ি পথের পাশের নিচে ফেলে দিয়ে হেঁটে এগোল। সন্ধে হয়ে গেছে তখন। তুষারপাত থেমে গেছে সম্পূর্ণ। পরিষ্কার আকাশে একটা দুটো তারা দেখা দিয়েছে।

আরও এক মাইল যেতে সেই ঘোড়াটানা ওয়াগনের দেখা পাওয়া গেল। ২৫ তারিখ থেকে ওই একই জায়গায় আছে ওটা। গাড়ি দেখলেই হয় এদিকে যায়, নয়তো ওদিকে। আসলে সবটাই ভান। গ্রাম্য, প্রায় ট্রাফিকশূন্য রাস্তা বলে এই আয়োজন করেছিল ড্রিউনস্কি। 'চালক' নিয়মিত অদল-বদল হয়েছে, ঘোড়াও, কিন্তু ওয়াগন জায়গা ছেড়ে নড়েনি।

চোখ কুঁচকে রাহাতের কাঁধে ঝোলানো শেমিসারটা দেখল প্রতিরোধ যোদ্ধা, ওর ওপর দিয়ে ঘুরে জেরি লুবানস্কির মুখে স্থির হলো তার নজর। 'রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে,' বলল সে। 'আপনারা চাইলে গরীবখানায় আশ্রয় নিতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর রাহাত। 'খুব ভাল হয় তাহলে। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ক'টা বাজে?'

'দুঃখিত। আমার ঘড়ি বন্ধ।'

এ-কান ও-কান চওড়া হাসি দিল চালক। 'ওফ্, বাঁচালেন! আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম আপনাদের।' হঠাৎ চোখ কুঁচকে উঠল তার। 'আরেকজন...?'

'দুঃখিত,' রাহাত বলল আরেকদিকে তাকিয়ে। 'সে আটকে গেছে।'

বারো

অশউইৎজ। রাত আটটা।

থমথমে নীরবতা। ক্যাম্পে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কারফিউ জারি করা হয়েছে। বন্দীরা সবাই যে যার হাটে চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। কি হয় কি হয় করে অস্থির। এর মধ্যে ঘটনা সবার জানা হয়ে গেছে। মেজর ও ক্যাপ্টেনের লাশও দেখেছে কেউ কেউ। সন্ধের একটু পর বড় এক অফিসার এসেছে, এই পর্যন্ত জানে বন্দীরা, তারপরই এসএসদের তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়তে হয়েছে হাটে।

ওই অবস্থায়ই রোল কল করা হয়েছে, তারপর আর কোন তৎপরতা নেই। প্রত্যেকটা হাটের সামনে দু'জন করে সশস্ত্র গেস্টাপো দাঁড়িয়ে আছে।

ওদিকে দূরে কোথাও; খুব সম্ভব হের কোমান্ড্যান্টের অফিসের পাশ থেকে ঠুক্ ঠুক্ শব্দ আসছে। বন্দীরা কেউ দেখেনি কি হচ্ছে ওখানে, তবে আন্দাজ করছে কফিন তৈরি করা হচ্ছে। এ ছাড়া

আর কি হতে পারে?

অফিসের ভেতরে জ্বলন্ত স্টোভের কাছে বসে আছে স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যান। ক্যাম্প পর্যন্ত যে বেঁচেবর্তে আসতে পেরেছে, তাতেই খুশি। এ মুহূর্তে ভীষণ অন্যমনস্ক সে। থেকে থেকে রুমের আরেক মাথায় চোখ যাচ্ছে। ওখানে পাশাপাশি শুয়ে আছে জার্মান পতাকায় ঢাকা মেজর ও ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ। পরেরটা রক্তে ভিজে একাকার।

অন্যদিকে কোমান্ড্যান্টের মেয়ে সেক্রেটারি অঝোর ধারায় কাঁদছে, সেই সাথে শুৎজস্টাফেল চীফ, রাইখসফিউরার হেইনরিখ হিমলারকে ধরার জন্যে নিউম্যানের নির্দেশে বার্লিনের এখানে-ওখানে ফোন করছে একের পর এক। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

এক সময় সচকিত হলো নিউম্যান। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অনির্দিষ্ট লক্ষের উদ্দেশে বলল, 'এই...এই গন্ধটা কিসের? কিচেনে মাংস পুড়ছে নাকি?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই এনসিও, একজন বেশ দ্বিধার সাথে ঘটনা খুলে বলল। স্টার্মব্যানফিউরার নিউম্যান পর্যন্ত কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভাষা হারিয়ে ফেলল গন্ধটার উৎপত্তি জেনে।

সেদিনই গভীর রাতে সীমান্ত অতিক্রম করে চেকস্লোভাকিয়ায় ঢুকে পড়ল রাহাত ও জেরি লুবানস্কি। ড্রিউনস্কির সহযোদ্ধারা বর্ডারে চেক-প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে ওদের তুলে দিয়ে ফিরে গেল। মেজর রাহাতের জানা হলো না, ওকে ধরার জন্যে স্বয়ং হিটলারের নির্দেশে সীল করে দেয়া হয়েছিল পোল্যান্ড-চেক বর্ডার।

তবে হিমলারের কান হয়ে হিটলার পর্যন্ত খবর পৌঁছতে দেরি হয়ে যাওয়ায় অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ওরা। ফিউরারের নির্দেশ

মাসার আগেই বর্ডার ক্রস করে চলে এসেছে। প্রাগের জার্মান গভর্নর, হিমলারের ডানহাত, রেইনহার্ড হাইড্রিচ ওদের ধরতে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল বর্ডারে।

তিনদিন পর বাল্টিক সাগরতীরে পৌঁছল ওরা অনেক পথ ঘুরে। তারপর সেখান থেকে নর্থ সী হয়ে যেদিন ইংল্যান্ড পৌঁছল, সেদিন ১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি।

***